রাষ্ট্রবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

ভাগ - ১ ও ২

একাদশ শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

একাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
খোয়াই জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি করেছেন

বহর উদ্দিন, শিক্ষক

শ্রী জীবন চন্দ্র দাস, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রী অজয় পাল, শিক্ষক

ড. প্রদীপ দে, শিক্ষক

শ্রীমতী রশ্মিতা দেব, শিক্ষিকা

শ্রী দীপক ঘোষ, শিক্ষক

শ্রীমতী পিয়ালী ধর, শিক্ষিকা

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়	সংবিধান কেন এবং কিভাবে রচিত হয়?	০৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভারতীয় সংবিধানে অধিকার	১২
তৃতীয় অধ্যায়	নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্ব	১৮
চতুর্থ অধ্যায়	শাসন বিভাগ	২২
পঞ্চম অধ্যায়	আইন বিভাগ	২৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	বিচার বিভাগ	৩২
সপ্তম অধ্যায়	যুক্তরাষ্ট্রীয় মতবাদ	৩৭
অষ্টম অধ্যায়	স্থানীয় সরকার	৪২
নবম অধ্যায়	সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল	৪৬
দশম অধ্যায়	সংবিধানের দর্শন	৫০

দ্বিতীয় ভাগ

c_g Aa¨vq	ivR‰bwZK ZË	54
wØZxq Aa¨vq	¯vaxbZv	57
ZZxq Aa¨vq	mvg¨	61
PZ_ Aa¨vq	mvgwRK b¨vq	65
cÂg Aa¨vq	AwaKvi	69
Iô Aa¨vq	bvMwiKZv	73
সপ্তম অধ্যায়	RvZxqZvev`	78
অষ্টম অধ্যায়	ধর্মনিরপেক্ষতা	84
নবম অধ্যায়	শান্তি	89
দশম অধ্যায়	Dbqb	94

প্রথম অধ্যায়

সংবিধান কেন এবং কিভাবে রচিত হয় ?

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় সংবিধানের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বা বিষয় সম্পর্কে জানব। শিক্ষার্থীরা নির্বাচন, সরকার, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে জানতে পারবে। যে সব নীতি বা কাঠামোর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে বা সুসংহতভাবে কাজ করতে পারে এবং যেগুলো ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেইসব বিষয় জানা খুব প্রয়োজন।

একটি সংবিধান হল এমন কতকগুলো মৌলিক নীতির আধার যেগুলোর মাধ্যমে একটি দেশ গঠিত হয় অথবা শাসিত হয়। এটি স্থির করে ওই সমাজের নীতিগুলো কে নির্ধারণ করবে, নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত কে নেবে।

সংবিধান আমাদের কেন প্রয়োজন ঃ

(i) সংবিধান নিরাপত্তা দান করে এবং সমন্বয় বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। সংবিধান এমন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে, যার দ্বারা ওই সমাজের সকল সদস্যদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। (ii) সংবিধান স্থির করে, একটি সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, কীভাবে সরকার গঠিত হবে। (iii) সংবিধান জনগণের উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মাপকাঠি স্থির করে। এই মাপকাঠি হবে অবশ্যই চরম বা চূড়ান্ত, একটি সরকারের পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। (iv) সংবিধানের একটি কাজ হল, সরকারকে এমনভাবে সামর্থ্যবান করা, যাতে সে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একটি ন্যায় পরায়ণ সমাজ নির্মাণের পূর্বশতগুলো পূরণ করতে পারে।

সমাজের লক্ষ্য এবং আশা আকাঙ্খা ঃ

প্রাচীন সংবিধানগুলোর অধিকাংশই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতাবণ্টন এবং সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সংবিধান, যার মধ্যে ভারতের সংবিধান একটি বিশেষ উদাহরণ, এমন কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, যার মাধ্যমে সরকার কিছু ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে এবং সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই দিক থেকে ভারতীয় সংবিধান বিশেষ সৃষ্টিশীল বা অনুসরণীয়।

জনগণের মৌলিক পরিচয় ঃ

পরিশেষে বলতে গেলে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, একটি সংবিধান জনগণের বিশেষ গুরুত্ব বা চুড়ান্ত পরিচয় স্পষ্ট করে দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এর অর্থ হল, একটি সম্মিলিত সত্তা হিসাবে জনগণ কার্যকরী ভূমিকা নেয় প্রাথমিকভাবে সংবিধানের স্বীকৃতির মাধ্যমেই এবং তা সম্ভব হয় এমন কিছু প্রাথমিক নিয়মনীতির দ্বারা যেগুলো ঠিক করে দেয় কে শাসন করবে, আর কে শাসিত হবে। কিছু সাধারণ নিয়মনীতির সঙ্গে সহমত পোষণ করার পরিপ্রেক্ষিতে একজনের একটি রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে উঠে। সাংবিধানিক রীতিগুলো হল একটি বৃহৎ কাঠামো যার মধ্যে থেকে ব্যক্তি তার নিজস্ব লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতা পূরণ করার চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রে কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না, তা নিয়ে কর্তৃত্বমূলক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে সংবিধান। এ কারণে সংবিধান কিছু মৌলিক মূল্যবোধের কথা বলে যেগুলো আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না।

সংবিধান কার্যকর করার পদ্ধতি বা উপায় ঃ

একটি সংবিধান কীভাবে কার্যকর হয়? কে সংবিধান রচনা করে? এবং সে কাজে ঐ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কতটুকু? অনেক দেশেই সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সংবিধান রচিত হয় সেনাপ্রধানদের দ্বারা, যারা জনপ্রিয় নন এবং যারা সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলতে সম্মত নন। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার মতো দেশের সফল সংবিধানগুলো মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের পর রচিত হয়েছিল। যদি ও ভারতীয় সংবিধান ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সূত্রে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের যথার্থ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। এর ফলে এই সংবিধান যথেষ্ট বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সংবিধানের বাস্তব উপযোগিতা ঃ

একটি সফল সংবিধানের প্রকৃত রুপ হলো এই যে, প্রতিটি ব্যক্তি এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার মতো বিশেষ কিছু কারণ খুঁজে পাবে। যদি কোনো সংবিধান পাকাপাকিভাবে এমন ব্যবস্থা তৈরি করে যাতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সংখ্যাগুরুর দ্বারা অবদমিত হতে থাকে, তবে সেই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার কোনো কারণ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী খুঁজে পাবে না। যদি এটি অন্যের স্বার্থ বিসর্জনের মাধ্যমে কোনো একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধা-অসুবিধার ধারক হয় তবেও গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রকৃতপক্ষে যে সংবিধান সমাজের যত বেশি মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যকে নিশ্চিত করতে পারে, সেই সংবিধান ততবেশি সফল বলে বিবেচিত হয়।

ভারসাম্যযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

অনেক সময় দেখা যায়, জনগণ না চাইলেও কোনো বিশেষ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ বা ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনও কখনও সংবিধান পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু সুচিন্তিতভাবে রচিত সংবিধানে ক্ষমতাকে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় যে, সমাজের কোনো গোষ্ঠীই তখন আর সংবিধানকে উচ্ছেদ বা পরিত্যাগ করতে পারে না। এমন সুরচিত সংবিধানের একটি বিশেষ দিক হল এটি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একচেটিয়া ক্ষমতা লাভের পথ তৈরি করে না। উদাহরণস্বরুপ ভারতীয় সংবিধান যেমন, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে আনুভূমিকভাবে ক্ষমতা বণ্টন করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এটি আবার নির্বাচন কমিশনের মতো একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থার হাতেও ক্ষমতা প্রদান করেছে।

বৌদ্ধিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, একটি সংবিধান অবশ্যই বিভিন্ন আদর্শ, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতির মধ্যে সমতা রক্ষার্থে একটি কর্তৃত্বমূলক নির্দেশিকা রুপে প্রকাশিত হবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নমনীয় হবে।

ভারতীয় সংবিধান কীভাবে রচিত হয়েছে?

প্রাথমিকভাবে ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়েছিল একটি গণপরিষদের দ্বারা, যা মূলত গঠিত হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের জন্য। এই গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। তবে পরবর্তী সময়ে বিভক্ত ভারতের জন্য এই পরিষদের অধিবেশন হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট। এই পরিষদ তখন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বিভিন্ন আঞ্চলিক বিধান পরিষদগুলোর দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়।

গণপরিষদের গঠন ঃ

১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধান দ্বারা ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর ফলে গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা ২৯৯ জনে নেমে এল। ভারতের সংবিধান

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয়েছিল এবং তা কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে। বিভিন্ন বিষয়ে কার্যপরিচালনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদের আটটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণত জওহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল অথবা ডঃ বি.আর. আম্বেদকরই এসব কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করেছিলেন। পরিষদ তার কার্য সম্পাদনের জন্য দু-বছর এগারো মাস সময় নিলেও দিন হিসাবে এই পরিষদ কাজ করেছিল মূলত ১৬৬ দিন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার

নেহেরুর দ্বারা উত্থাপিত ১৯৪৬ সালের প্রস্তাবটিই ছিল গণপরিষদের কাছে জাতীয়তাবাদী আলোচনা প্রসূত সাংবিধানিক নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব। এটি পরিষদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করতে পেরেছিল। এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সংবিধান কতকগুলো মৌলিক প্রতিশ্রুতির বিধিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়। যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সার্বভৌমিকতা এবং বিশ্বজনীনতা ইত্যাদি।

তাই আমাদের সংবিধান শুধুমাত্র কিছু নীতি বা পদ্ধতির এক জটিল সমাহারই নয়। একই সঙ্গে এই সংবিধান ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দেশের জনগণের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল, তার যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের এক হাতিয়ারও বলা চলে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ :-

সাংবিধানিক কার্যকারিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। এক্ষেত্রে মূল শর্তটি হল সরকারকে হতে হবে গণতান্ত্রিক এবং জনসাধারণের উন্নতি বা কল্যাণের জন্য দায়বদ্ধ। আর এই প্রচেষ্টাই ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সংসদ চালিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সরকারি ক্ষমতাকে আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে বণ্টন করার পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়টিকে এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান থেকে যে সকল বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;—

ব্রিটিশ সংবিধান → রাষ্ট্র প্রধানের বিশেষ পদ;
→ সংসদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা
→ আইনের অনুশাসনের ধারণা
→ অধ্যক্ষের পদ এবং এর ভূমিকা
→ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আমেরিকার সংবিধান → মৌলিক অধিকার সম্বলিত সনদ;
→ বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা।

আয়ারল্যান্ডের সংবিধান → রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি;

ফ্রান্সের সংবিধান → স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতিসমূহ;

কানাডার সংবিধান → আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি ব্যবস্থা;
→ অবশিষ্ট ক্ষমতার ধারণা।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধান হল এমন একটি দলিল যা সংবিধান প্রণেতাগণ তাঁদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফসল হিসেবে দেশের জনগণকে উপহার দিয়েছেন, যার মধ্যে দেশের জনগণের মৌলিক আদর্শ, মূল্যবোধ তথা আশা-আকাঙ্খা সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই আমাদের সংবিধান হল এমন একটি অনন্য দলিল যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান অনুসরণ করেছে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) গণপরিষদের সভাপতি কে ছিলেন -

(ক) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, (খ) ডঃ বি. আর আম্বেদকর,

(গ) এম. এন রয়, (ঘ) জওহর লাল নেহেরু।

উঃ- ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।

২) গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে হয় -

(ক) ৬ আগষ্ট ১৯৪৬, (খ) ৯ আগষ্ট ১৯৪৬, (গ) ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯, (ঘ) ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০।

উঃ- (খ) ৯ আগষ্ট ১৯৪৬।

৩) ভারতে সংবিধানের জন্য প্রথম প্রস্তাব কে দেন -

(ক) জওহরলাল নেহেরু, (খ) মহাত্মা গান্ধী, (গ) এম.এন.রয়, (ঘ) জে.বি কৃপালিনী।

৪) স্বাধীনতার পরে ভারতে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ৩৯৯, (খ) ২৯৯, (গ) ১৯৯, (ঘ) ৪৯৯।

৫) সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

(ক) ডঃ বি.আর আম্বেদকর, (খ) এম.এন রয়,

(গ) মহাত্মা গান্ধি, (ঘ) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

৬) কিসের প্রভাবে গণপরিষদের গঠনের সিদ্ধান্ত হয় -

(ক) ভারত শাসন আইন ১৯৩৫, (খ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,

(গ) কেবিনেট মিশন প্ল্যান-১৯৪৬ (ঘ) ভারত শাসন আইন ১৯০৯।

৭) গণপরিষদের প্রথম সভা কোথায় হয়?

(ক) দিল্লি, (খ) বোম্বে (গ) মাদ্রাজ, (ঘ) লাহোর।

৮) সংবিধানের খসড়া কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?

(ক) ৬ জন, (খ) ৭ জন, (গ) ৮ জন, (ঘ) ৯ জন।

৯) গণপরিষদে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল -

(ক) ২০৬ জন, (খ) ২০৮ জন, (গ) ২১০ জন, (ঘ) ২৪ জন।

১০) ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ..... থেকে।

(ক) আমেরিকা, (খ) ব্রিটেন, (গ) অস্ট্রেলিয়া, (ঘ) কানাডা।

নীচের প্রশ্নগুলোর GK K_vq DËi `vI:- ১×১=১

১) সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

২) ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

৩) ভারতের সংবিধান প্রধানতঃ কোন্ দেশের সংবিধানকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে?

৪) কে প্রথম সংবিধানের প্রস্তাবনার জন্য প্রস্তাব রাখেন?

৫) মূল সংবিধানে কয়টি ধারা ছিল?

৬) ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ধারণাটি কোন দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

৭) গণপরিষদ প্রকৃত পক্ষে মোট কত দিন কাজ করেছিল?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও t- 2×1=2

১) ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত ও কবে কার্যকরী হয়েছে?

উত্তর ঃ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এবং কার্যকর হয়েছিল ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে।

২) সংবিধান বলতে কী বোঝ?

৩) ভারতীয় মূলসংবিধানে কতগুলো ধারা, তপশীলি ও ভাগ ছিল?

৪) মুসলিম লীগ গণপরিষদ কেন ত্যাগ করেছিল?

৫) ভারতীয় গণপরিষদ কীভাবে গঠিত হয়েছিল?

৬) ভারতীয় সংবিধানের এমন দুটো বৈশিষ্ট্য লেখো যেগুলো ব্রিটিশ সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছিল?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 5×1=5

১) সংবিধানের চারটি কাজ লেখো?

২) সংবিধান মানুষের আশা আশাঙ্খাকে কীভাবে পূরণ করে?

৩) গণপরিষদ কীভাবে গঠিত হয়েছিল?

৪) গণপরিষদের কার্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা করো?

৫) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি লেখো?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানে অধিকার

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এদেশের জনগণের অধিকার ও দাবিগুলোর গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহেরু কমিটি এই মর্মে একটি দাবি সনদ পেশ করে। ফলে স্বাধীনতার পর সংবিধানে নাগরিক অধিকারের একটি তালিকা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় এবং তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়। এই অধিকারগুলোকেই মৌলিক অধিকার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যান্য সাধারণ অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারগুলোর বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত সাধারণ আইনের উপর ভিত্তি করে সাধারণ অধিকারগুলো গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। সাধারণ নিয়মানুযায়ী আইনসভা কর্তৃক সাধারণ অধিকারগুলো পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মৌলিক অধিকার পরিবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কোনো সরকারি সংস্থা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এমন কোনো কাজ করতে পারে না। সরকারের শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের অযৌক্তিক কার্যাবলি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করলে বিচারবিভাগ তা বে-আইনী ঘোষণা করতে পারে। অবশ্য মৌলিক অধিকারগুলো সীমাহীন ও চূড়ান্ত অধিকার নয়। সরকার প্রয়োজনে মৌলিক অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

সাম্যের অধিকার (১৪-১৮নং ধারা) ঃ-

আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান ও আইন কর্তৃক সকলের সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার।

- রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান বা স্ত্রী-পুরুষভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না।

  সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য সকল ভোজনালয়, স্নানাগার, দোকান, পুষ্করিণী এবং অন্যান্য প্রমোদস্থলে সকলের সমান প্রবেশাধিকার থাকবে।

- সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার থাকবে।

- অস্পৃশ্যতার নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে এবং

- সরকার কর্তৃক সকল প্রকার খেতাব বা উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা) ঃ-

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকারগুলো হল —

→ বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

→ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।

→ সমিতি ও সংঘ গঠনের অধিকার।

→ ভারতের অভ্যন্তরে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।

→ ভারতীয় ভূ-খণ্ডের যে কোনো অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার।

→ যে কোনো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ এবং ব্যবসা বাণিজ্য চালানোর অধিকার।

→ কোনো অপরাধের জন্য নাগরিককে বিধিবহির্ভূত ও অতিরিক্ত শাস্তির হাত থেকে সুরক্ষার অধিকার।

→ জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

→ শিক্ষার অধিকার।

→ নাগরিককে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার ও আটকের হাত থেকে সুরক্ষার অধিকার।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা) ঃ-

- মানুষের ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো এবং বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- শিশুদেরকে কারখানায়, খনি বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ নং ধারা) ঃ-

- ভারতের সকল নাগরিক বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে যে কোনো ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম পালন ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী।
- ভারতের প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা এর যে কোনো অংশ, ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এবং ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন কার্যনিবাহ করতে পারবে।
- কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যাবে না।
- সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষাদান করা, সেইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংস্কৃতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার (২৯০৩০ নং ধারা) ঃ-

- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপির ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করার অধিকার স্বীকৃত। এছাড়াও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর নিজস্ব পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার স্বীকৃত।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ-

- মৌলিক অধিকার বলবৎ করণের জন্য নাগরিকগণ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং এই অধিকারগুলো বলবৎ করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট বিভিন্ন প্রকার আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে। এগুলো হল —

ক) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas corpus) ঃ-

বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ কথার অর্থ হল 'বন্দিকে সশরীরে আদালতে হাজির করা'। এই আদেশ বলে আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আটককৃত ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। আটক বিধিসম্মত না হলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন।

খ) পরমাদেশ (Mandamus) ঃ-

'পরমাদেশ' কথার অর্থ 'আমরা আদেশ দিচ্ছি'। আদালত এই লেখ জারির মাধ্যমে সরকার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও অধস্তন আদালতকে আইনানুগ কর্তব্য পালনের নির্দেশ প্রদান করে।

গ) প্রতিষেধ (Protibition) ঃ-

'প্রতিষেধ' কথার অর্থ হল 'নিষেধ করা'। এই আদেশ জারি করে উর্ধ্বতন আদালত নিম্ন-আদালতকে তার অধিকার বহির্ভূত কার্য-সম্পাদনে বিরত রাখেন।

ঘ) অধিকার পৃচ্ছা (Quo warranto) ঃ-

কোনো ব্যক্তি যদি এমন পদ বা অধিকার দাবি করে, যে পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা তার নেই, তাহলে আদালত তার দাবির বৈধতা বিচারের জন্য লেখ জারি করে। আইনসঙ্গত নয় বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হয়।

ঙ) উৎপ্রেষণ (Certiorari) ঃ-

'উৎপ্রেষণ' কথার অর্থ হল 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া'। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতে চলাকালীন কোনো মামলার সুবিচারের জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করার আদেশ দিতে পারে। এই লেখ জারির মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তকে এক্তিয়ার বহির্ভূত সিদ্ধান্ত বলে বাতিল করতে পারে।

বিচারবিভাগ ছাড়াও নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশন, জাতীয় তপশিলী জাতি কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রভৃতি।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ঃ

সংবিধান প্রণেতাগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল সকল নাগরিকের সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সকলের কল্যাণ সাধন করা। তাই সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতির একটি পৃথক তালিকা সংবিধানে সংযোজিত হয়। রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতি সংবিধানের এই নির্দেশগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি বলা হয়।

লক্ষ্য ঃ

⇒ জনকল্যাণ ঃ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

⇒ জীবনের মান উন্নয়ন ঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদের সমবন্টন ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ। আন্তর্জাতিক শান্তির প্রসার ঘটানো।

নীতিসমূহ (Policies)

⇒ অভিন্ন দেওয়ানি আইন।

⇒ মদ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ।

⇒ কুটির শিল্পের উন্নয়ন।

⇒ গৃহপালিত পশু হত্যার উপর বিধিনিষেধ আরোপ।

⇒ গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন।

আদালত বহির্ভূত অধিকার সমূহ (Non-Justiciable Rights) ঃ-

⇒ পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার।

⇒ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমকাজে সমমজুরির অধিকার।

⇒ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।

⇒ কর্মের অধিকার।

⇒ ৬ বছরের নীচে শিশুদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও শিক্ষার অধিকার।

১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে কতগুলো মৌলিক কর্তব্যের সংযোজন করা হয়েছে। সে সময় মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা ছিল ১০টি। বর্তমানে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা ১১টি করা হয়েছে। এই মৌলিক কর্তব্যগুলো কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধানে বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির সম্পর্ক ঃ

মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিগুলি একে অপরের পরিপূরক মৌলিক অধিকারগুলো সরকারের অসাংবিধানিক কাজে বিরত রাখে এবং নির্দেশমূলক নীতিগুলো সরকারকে উন্নয়নমূলক কর্মসম্পাদনে উৎসাহিত করে। মৌলিক অধিকার প্রধানত ব্যক্তির অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে নির্দেশমূলক নীতিগুলো সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে।

সমাজ সংস্কারক জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০) অধিকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, অধিকারের মধ্যেই সনিহিত থাকে নাগরিকের স্বাধীনতা ও সাম্য। সুদীর্ঘকালের এই আদর্শকে অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলো মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 1×1=1

১) ভারতের সংবিধানের কততম অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে?

(ক) প্রথম, (খ) দ্বিতীয়, (গ) তৃতীয়, (ঘ) চতুর্থ।

উঃ- (গ) তৃতীয়।

২) বর্তমানে ভারতের জনগণ কয় ধরণের মৌলিক অধিকার ভোগ করে?

(ক) ৬টি, (খ) ৭ টি, (গ) ৮টি, (ঘ) ৯ টি।

উঃ- (ক) ৬ টি।

৩) অস্পৃশ্যতাকে বে আইনী বলা হয়েছে সংবিধানের কত নং ধারায়?

(ক) ধারা ১৫, (খ) ধারা ১৬, (গ) ধারা ১৭, (ঘ) ধারা ১৮।

৪) কত বছরের কম শিশুদেরকে কারখানায় নিযুক্তিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সংবিধানে?

(ক) ১২ বছরের, (খ) ১৩ বছরের, (গ) ১৪ বছরের, (ঘ) ১৫ বছরের।

৫) ভারতের সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে কততম সংশোধনীর মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে?

(ক) ৪১ তম, (খ) ৪২ তম, (গ) ৪৩ তম, (ঘ) ৪৪ তম।

৬) ভারতের মানবাধিকার কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল?

(ক) ১৯৯৩, (খ) ১৯৯১, (গ) ১৯৯৪, (ঘ) ১৯৯২।

৭) ভারতীয় সংবিধানে মোট কয়টি মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে?

(ক) ১০ টি, (খ) ১১ টি, (গ) ১২ টি, (ঘ) ১৩ টি।

৮) সংবিধানের কত নং ধারাগুলো নির্দিশমূলক নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করে?

(ক) ২৬ থেকে ৪১, (খ) ৩০ থেকে ৪৫, (গ) ৩৬ থেকে ৫১, (ঘ) ৪০ থেকে ৫৫।

৯) 'প্রতিষেধ' জারি করতে পারে কোন্ কোর্ট?

(ক) সুপ্রীম কোর্ট, (খ) হাইকোর্ট, (গ) জেলা কোর্ট, (ঘ) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট দুইই।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 2×1=2

১) একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি কী কী অধিকার ভোগ করতে পারেন?

২) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ বলতে কী বোঝ?

৩) পরমাদেশ কাকে বলে?

৪) প্রতিষেধ বলতে কী বোঝায়?

৫) উৎপ্রেষণ বলতে কী বোঝ?

৬) মানবাধিকার কমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করো।

৭) ভারতের সংবিধান থেকে সম্পত্তির অধিকারকে কবে এবং কেন বাদ দেওয়া হয়েছে?

৮) Right of Bill কাকে বলে?

৯) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে কী বোঝ?

১০) নির্দেশমূলক নীতির দুটি লক্ষ্য উল্লেখ করো।

১১) রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণির লোকের উন্নতির জন্য কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

১২) অধিকার ইচ্ছা বলতে কী বোঝায়?

১৩) ভারতীয় নাগরিকগণ বর্তমানে কয়টি মৌলিক অধিকার ভোগ করে?

১৪) মৌলিক অধিকার কাকে বলে?

১৫) নির্দেশমূলক নীতি বলতে কী বোঝায়?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 6×1=6

১) ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২) ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলো কী কী আলোচনা করো।

৩) মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো কী কী ভাবে ক্ষুন্ন হতে পারে? মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

৪) ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত সাম্যের অধিকার সম্পর্কে লেখো?

৫) স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করো?

৬) সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করো?

৭) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত বিধি ব্যবস্থাগুলো আলোচনা করো?

৮) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্ব

এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সংবিধানের ধারা ও নির্দেশগুলো পাঠ করব। এছাড়াও সংবিধান স্বীকৃত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুরুত্ব কী এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সংবিধানের নির্দেশগুলো কী কী, সে বিষয়েও আলোচনা করব।

নির্বাচন ও গণতন্ত্র ঃ

বর্তমানে নির্বাচন হয়ে উঠেছে গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ রূপ। অবশ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের দৈনন্দিন কাজকর্মের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নাগরিকগণ সরাসরি অংশ গ্রহণ করে, তাকেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে। প্রাচীন গ্রীস দেশের নগররাষ্ট্রে এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অকার্যকর, এ কারণে জনগণের শাসন বলতে সাধারণত বোঝায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন।

গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কতকগুলো মৌলিক নীতি লিপিবদ্ধ থাকে। এই মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আইন বিভাগ নির্বাচন পরিচালনার জন্য যাবতীয় আইন প্রণয়ন করে।

মূলনীতিগুলো সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত —

- কারা ভোট প্রদান করতে পারবে?
- নির্বাচনে কারা প্রার্থী হতে পারবে?
- কারা নির্বাচন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করবে?
- কীভাবে ভোটদাতাগণ তাদের প্রতিনিধি পছন্দ করবে?
- কীভাবে ভোট গণনা হবে এবং প্রতিনিধি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবে?

অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংবিধানের মতো ভারতীয় সংবিধানে ও উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ভারতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হয় শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী নীতি স্থায়ী সরকার গঠনে উপযোগী নয়। স্বাধীনতার পর ভারতে নির্বাচনী ক্ষেত্রে এই সংখ্যাধিক্য বা FPTP পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভাগুলোর নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ঃ

অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতে অনেক গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল নির্বাচনী কাজের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন। ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ নং ধারায় একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ রয়েছে, যার হাতে যাবতীয় নির্বাচন পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের কাজ ঃ

ভারতের নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হয় —

- একটি ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের তত্ত্বাবধান করে। এক্ষেত্রে সকল বৈধ ভোটারের নাম তালিকাভূক্ত করা এবং মৃত বা অবৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাতিল করার কাজ কমিশনকে করতে হয়।

- কমিশন নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নির্ঘন্ট স্থির করে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেখানে মনোনয়নপত্র দাখিলের শুরুর এবং শেষদিন ধার্য থাকে, দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিন এবং প্রত্যাহার করার নির্দিষ্ট দিন ও উল্লেখ করা থাকে। এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে ভোট গ্রহণের তারিখ, সময়, গণনার দিন এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ উল্লেখ থাকে।

- অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে।

- নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান ও তাদের দলীয় প্রতীক চিহ্ন বরাদ্দ করে।

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মীসংখ্যা খুব কম। এ কারণে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে থাকে। নির্বাচনের কাজ একবার শুরু হলে এর সাথে যুক্ত প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মচারীরাই কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীন, স্বয়ংশাসিত ও নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে কমিশন বছরের পর বছর ধরে কাজ করে চলেছে। কমিশন দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বজায় থাকে।

নির্বাচনী সংস্কার ঃ

কোনো নির্বাচন প্রক্রিয়াই ত্রুটিমুক্ত নয়। কাজ করার সময় কমিশনের অনেক ত্রুটি ও বাধ্যবাধকতা থাকে। নির্বাচনী কাজের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, অনেক স্বাধীন সংস্থা, বিশেষজ্ঞরা এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এগুলো হল —

- আমাদের বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। বর্তমানে অনুসৃত FPTP বা সংখ্যাধিক্য পদ্ধতির পরিবর্তে PR বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। এর ফলে প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলো আইনসভায় আসন সংখ্যা লাভ করবে।

♦ পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ রাখা উচিত।

♦ নির্বাচনী রাজনীতিতে অবৈধ অর্থের ব্যবহার নির্মূল করার জন্য শক্তিশালী আইনী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত একটি বিশেষ তহবিল থেকে নির্বাচনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা।

♦ সকল রাজনৈতিক দলের উপর সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রয়োগ করা উচিত, যাতে তারা নির্বাচনী কাজে বৈধ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে আরো বেশি কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সে দেশের নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রতিনিধিদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- ১ x ১ = ১

১) ভারতের লোকসভায় কয়টি আসনে নির্বাচন হয়?

(ক) ৫৪৩ টি, (খ) ৫৪৫ টি, (গ) ৫৫০ টি, (ঘ) ৫৫৫ টি।

উঃ- (ক) ৫৪৩ টি।

২) সংবিধানের কত নং ধারায় একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের কথা বলা হয়েছে?

(ক) ৩২৪, (খ) ৩২৬, (গ) ৩২৭, (ঘ) ৩২৮।

উঃ- (ক) ৩২৪।

৩) নির্বাচন কমিশনের কার্যকালের মেয়াদ কত?

(ক) পাঁচ বছর, (খ) ছয় বছর, (গ) সাত বছর, (ঘ) চার বছর।

৪) রাজ্য বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বয়স কত?

(ক) ১৮ বছর, (খ) ২১ বছর, (গ) ২৫ বছর, (ঘ) ৩০ বছর।

৫) ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার আসন সংখ্যা কত?

(ক) ৫০টি, (খ) ৬০টি, (গ) ৭০টি, (ঘ) ৮০টি।

৬) কোন বক্তব্যটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ?

(ক) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, (খ) ক্লাস মনিটরের নির্বাচন,

(গ) রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী বাছাই করা, (ঘ) গ্রামসভা কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৭) কোন্ কাজটি নির্বাচন কমিশন করে না?

(ক) ভোটার তালিকা তৈরি করা, (খ) প্রার্থীর মনোনয়ন,

(গ) ভোটকেন্দ্র স্থাপন (ঘ) নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর করা।

৮) কোন্‌টি লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য?

(ক) ১৮ বা তার বেশি বয়স্ক প্রতিটি নাগরিকই ভোটদানের অধিকারী,

(খ) ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভোটারগণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের পছন্দ জানাতে পারে,

(গ) প্রতিটি ভোটের মান সমান, (ঘ) বিজয়ী প্রার্থীকে অবশ্যই অর্ধেকের বেশি ভোট লাভ করতে হবে।

৯) EPTP বা সংখ্যাধিক্য পদ্ধতিতে সেই প্রার্থীকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়, যিনি —

(ক) সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পোস্টাল ব্যালট লাভ করেন।

(খ) সমগ্র দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটলাভ করেছে এমন রাজনৈতিক দলের সদস্য।

(গ) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি কেন্দ্রে অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায় অধিক ভোট লাভ করেছে।

(ঘ) ৫০ শতাংশের বেশি ভোটলাভ করে প্রথম স্থান দখল করেছে।

নীচের প্রশ্নগুলোর এক কথায় উত্তর দাও ঃ- ১ x ১ = ১

১) ত্রিপুরা বিধান সভায় জনজাতিদের (ST) জন্য কয়টি আসন সংরক্ষিত আছে?

২) লোকসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ কত দিন থাকে?

৩) ২০১৯ লোক সভা নির্বাচন বিজেপি মোট কয়টি আসন জয় লাভ করে?

৪) সংবিধানের কত নং ধারায় Adult Franchises এর কথা বলা হয়েছে?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ- ২ x ১ = ২

১) লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার জন্য কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন?

২) সংখ্যাধিক্য নির্বাচন পদ্ধতি বা EP পদ্ধতি বলতে কী বোঝ?

৩) লোকসভা ও বিধানসভার প্রার্থীরা কীভাবে নির্বাচিত হন?

৪) রাজ্যসভায় সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতিটি লেখো?

৫) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বলতে কী বোঝ?

৬) সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্র বলতে কী বোঝ?

৭) স্থানীয় সরকারের কয়টি স্তর আছে ও কী কী?

৮) নির্বাচন কমিশনারকে কি ভাবে অপসারণ করা যায়?

৯) নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়?

১০) সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি বলতে কী বোঝ?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- ৬ x ১ = ৬

১) নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করো?

২) ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার কী কী সংস্কার আনা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো।

চতুর্থ অধ্যায়

শাসন বিভাগ

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিভাগ হল - আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগ সম্মিলিতভাবে সরকারের যাবতীয় কার্যসম্পাদন করে। যেমন, আইন প্রণয়ন করা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, শাসনকার্য পরিচালনা করা, আইনভঙ্গকারীর বিচার করা এবং সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক মঙ্গালসাধন করা। এই অধ্যায়ে আমরা সরকারের শাসনবিভাগের গঠন কাঠামো ও কার্যাবলির উপর আলোকপাত করব।

শাসন বিভাগ কী ?

শাসন বা প্রশাসন বলতে সেই পরিচালক মন্ডলীকে বোঝায় যারা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দেশের নিয়মকানুনগুলো বাস্তবায়নের কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন। শাসন বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যেটি আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন ওই নিয়মকানুনগুলো তৃণমূলস্তর পর্যন্ত কার্যকরী করে।

বিভিন্ন প্রকার শাসন বিভাগ ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি শাসিত দেশ। এখানে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। কানাডায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বর্তমান , সে দেশে রাণি এলিজাবেথ-২ হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান। ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই মিশ্র শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। জাপানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এদেশে সম্রাট হলে রাষ্ট্রের প্রধান, আর প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান। ইতালীর সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রকৃত প্রধান হিসাবে ক্ষমতা ভোগ করেন। রাশিয়ান শাসনব্যবস্থায় মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এদেশে রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান।

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্র ও সরকারের প্রকৃত প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই ব্যবস্থায় তিনি তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা বর্তমান। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকারের শাসকপ্রধান হন। এরুপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি, রাজা বা সম্রাট হলেন নিয়মতান্ত্রিক, প্রথাগত এবং আনুষ্ঠানিক প্রধান। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের হাতেই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। জার্মানি, ইতালি, জাপান, ইংল্যান্ড এবং পুর্তগাল প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমান। আংশিক রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী একই দলের সদস্য হতে পারেন বা ভিন্ন দলভূক্ত হতে পারেন এবং কোনো বিষয়ে এদের মধ্যে মতবিরোধও থাকতে পারে। ফ্রান্স, রাশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় এ ধরনের শাসনব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ঃ

ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ চেয়েছিলেন যে, সরকারের একদিকে যেমন থাকবে শক্তিশালী শাসন বিভাগ, অন্যদিকে শাসন বিভাগের স্বৈরাচারিতা ও ব্যক্তিপূজা প্রতিহত করার জন্য থাকবে অনেকগুলো রক্ষাকবচ। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় এমন কতগুলো কার্যকরী ব্যবস্থা থাকে, যার দ্বারা শাসন কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠে গণমুখী, উত্তরদায়ী, এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ভারতের সংবিধানে আঞ্চলিক এবং জাতীয় উভয়স্তরে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের আনুষ্ঠানিক প্রধান। বাস্তবে এই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের মাধ্যমে প্রয়োগ করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ৭৪(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি সেই মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি পুনর্বিবেচিত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির হাতে সংবিধান সম্মত ভাবে সরকারের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত প্রভূত ক্ষমতা থাকে। কিন্তু সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি প্রধানত তিনটি পরিস্থিতিতে নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

(ক) তিনি মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পরামর্শকে ফিরিয়ে দিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনা করার কথা বলতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি তার নিজস্ব মতামত আরোপ করতে পারেন।

(খ) পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত যে কোনো বিলে (অর্থবিল ব্যতীত) তিনি ভেটো প্রয়োগের মাধ্যমে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বিলটি স্থগিত বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

(গ) যখন নির্বাচনে লোকসভায় কোনো রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, তখন রাষ্ট্রপতি নিজ পছন্দমত ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ ঃ

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অবশ্যই লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকা উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। রাজনৈতিক গুরুত্ব ও অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রীসভায় তিন ধরনের মন্ত্রী থাকে। যেমন পূর্ণমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়। পার্লামেন্টের সদস্য নয় এমন কেউ যদি প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীপদে আসীন হন, তাহলে তাকে আগামী ৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়।

মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রীপরিষদের একতা ও সংহতির আদর্শ অনুসরণ করে যৌথ দায়িত্বশীলতা গড়ে ওঠে। এর ফলে কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। যৌথ দায়িত্বশীলতার নিয়ম অনুযায়ী কোন একজন মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে একমত না হলে হয় তাকে পদত্যাগ করতে হয় , নয় সিদ্ধান্তটি মেনে নিতে হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সরকারের মুখ্য ভূমিকা পালন করে, প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের সাথে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। এছাড়াও সরকারের

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রী যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন সেগুলো নিম্নরূপ —

তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক, লোকসভার নেতা, প্রশাসন ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালক, প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং নির্বাচনের সময় দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাজ্যস্তরে অনুরূপ সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে যে পার্থক্যটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল। যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন (কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শক্রমে) কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর মতো রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যাপালের অনেকগুলো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে।

স্থায়ী প্রশাসক ঃ আমলাতন্ত্র

প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যগণ এবং বিশাল সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মচারী নিয়ে সরকারের শাসন বিভাগ গঠিত। প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি হল এই সকল পেশাদার, দক্ষ, স্থায়ী, নিরপেক্ষ বেতনভূক সরকারি কর্মচারীগণ, সাধারণত এদেরকে আমলা বলা হয়। এদের প্রধান কাজ হল, রাষ্ট্রীয় আইনকে বাস্তবায়িত ও রক্ষা করা এবং সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচিকে বাস্তবে রুপায়িত করা।

রাষ্ট্রকর্তৃকের শ্রেণিবিভাগ ঃ

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকত্যক	কেন্দ্রীয় কত্যকসমূহ	রাজ্যকত্যক সমূহ
সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক (IAS)	ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যক (IFS)	আয়কর আধিকারিক
সর্বভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (IPS)	ভারতীয় রাজস্ব কৃত্যক (IRS)	

আধুনিক শাসন বিভাগ সরকারের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা। সরকারের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় শাসন বিভাগ অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। এ কারণে শাসন বিভাগের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ-

১) ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান কে?

(ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) রাষ্ট্রপতি, (গ) রাজ্যপাল, (ঘ) উপরাষ্ট্রপতি।

উঃ- (খ) রাষ্ট্রপতি।

২) ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ন্যূনতম বয়স কত?

(ক) ২৫ বছর, (খ) ৩০ বছর, (গ) ৩৫ বছর, (ঘ) ৪০ বছর।

উঃ- ৩৫ বছর।

৩) ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা কে?

(ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) উপরাষ্ট্রপতি, (গ) সুপ্রীমকোর্ট, (ঘ) রাজ্যপাল।

উঃ- (ক) প্রধানমন্ত্রী।

৪) কোনো অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কে নিয়োগ করেন।

(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) রাজ্যপাল, (গ) প্রধানমন্ত্রী, (ঘ) সুপ্রীম কোর্ট।

৫) সংবিধানের কত নং ধারায় জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়?

(ক) ৩৫২ নং ধারায়, (খ) ৩৫৬ নং ধারা, (গ) ৩৬০ নং ধারা, (ঘ) ৩৭০ নং ধারায়।

৬) ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন কে?

(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) রাজ্যপাল, (গ) সুপ্রীম কোর্ট, (ঘ) স্পীকার।

৭) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন কে?

(ক) স্পীকার, (খ) উপরাষ্ট্রপতি, (গ) রাষ্ট্রপতি, (ঘ) প্রধানমন্ত্রী।

৮) ভারতের রাষ্ট্রপতি কতবার নির্বাচিত হতে পারেন?

(ক) একবার, (খ) দুইবার, (গ) তিনবার, (ঘ) যত বার ইচ্ছা।

৯) রাষ্ট্রপতি মারা গেলে কতদিন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়ীত্ব পালন করতে পারেন?

(ক) একবছর, (খ) ছয়মাস, (গ) তিনমাস, (ঘ) একমাস।

১০) রাষ্ট্রপতি পদের শপথ বাক্য পাঠ কে করান?

(ক) স্পীকার, (খ) প্রধানমন্ত্রী, (গ) সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, (ঘ) উপরাষ্ট্রপতি।

১১) সংবিধানের কত নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়?

(ক) ৬১ নং ধারা, (খ) ৭৫ নং ধারা, (গ) ৭৬ নং ধারা, (ঘ) ৩৫৬ নং ধারা।

১২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত?

(ক) ২১ বছর, (খ) ২৫ বছর, (গ) ৩০ বছর, (ঘ) ৩৫ বছর।

১৩) ব্রিটেনে নামসর্বস্ব শাসক কে?

(ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) রাজা-রানি, (গ) রাষ্ট্রপতি, (ঘ) স্পীকার।

১৪) ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

(ক) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, (খ) ডঃ জাকির হোসেন, (গ) আম্বেদকর, (ঘ) ডঃ সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান।

১৫) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন ?

(ক) রাজ্যপাল, (খ) বিধানসভা, (গ) প্রধানমন্ত্রী, (ঘ) হাইকোর্টের বিচার পতি।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 2 X 1 = 2

১) সরকারের কয়টি বিভাগ ও কী কী?

২) শাসন বিভাগ বলতে কী বোঝ?

৩) একক শাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৪) যৌথ শাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৫) নাম সর্বস্ব শাসক কাকে বলে?

৬) আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

৭) শাসন বিভাগের দুটি কাজ উল্লেখ করো?

৮) ভারতের প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নির্বাচিত হন?

৯) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতিটি উল্লেখ করো?

১০) ভারতে কয় ধরণের জরুরি অবস্থা জারি করা যায় এবং তাদের ধারাগুলো লেখো।

১১) রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা বলতে কী বোঝ ?

১২) মন্ত্রিপরিষদের যৌথ দায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝায়?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো ঃ- 6 X 1 = 6

১) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিগুলো আলোচনা করো?

২) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো?

৩) রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো?

পঞ্চম অধ্যায়

আইন বিভাগ

পার্লামেন্ট বলতে জাতীয় আইনসভাকে বোঝায়। আর রাজ্যের আইনসভাসমূহকে বলা হয় রাজ্য বিধানসভা। ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ রয়েছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট বা কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষ হল উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ বা লোকসভা। রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধান এককক্ষ বা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা রেখেছে। বর্তমানে ভারতের ৬টি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। যেমন - অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানা।

রাজ্যসভা- রাজ্যসভা ভারতের অঙ্গারাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। রাজ্যসভা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত একটি সংস্থা। রাজ্যের নাগরিকগণ রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। বিধানসভার সেই নির্বাচিত সদস্যগণই রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত করেন। বিধানসভার সেই নির্বাচিত সদস্যগণই রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত করেন।

রাজ্যসভার সদস্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বচিত হন এবং পুননির্বাচিত ও হতে পারেন। প্রত্যেক দুইবছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশের কার্যকালের মেয়াদপূর্ণ হয়। আবার সমপরিমাণ নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন। এই কারণে রাজ্যসভাকে কখনো ভেঙ্গে দেওয়া যায় না। এইজন্য রাজ্যসভাকে পার্লামেন্টের স্থায়ী কক্ষ বলা হয়।

লোকসভা - লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে (বিধানসভার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোকে) জনসংখ্যার ভিত্তিতে কতগুলো কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী ক্ষেত্র বা কেন্দ্র থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। বর্তমানে লোকসভার ৫৪৩ টি নির্বাচনী ক্ষেত্র রয়েছে।

লোকসভার সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্টতা হারালে বা কোনো জোট সংখ্যাগরিষ্ট না হলে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুনভাবে নির্বাচন ঘোষণা করতে পারেন।

পার্লামেন্ট কী কাজ করে ?

পার্লামেন্টকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত থাকতে হয়। এগুলো হলো —

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ ঃ

পার্লামেন্ট বা আইনসভা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। আইন প্রণয়নের প্রধান ভূমিকা ছাড়াও পার্লামেন্টকে কিছু কিছু আইনের অনুমোদন দিতে হয়। ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিল পার্লামেন্টে পেশ করা যায় না।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা ঃ

পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাসন বিভাগ যাতে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করা।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

গণতন্ত্রে আইনসভাই কর নির্ধারণের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কীভাবে সরকারি অর্থ ব্যয়িত হবে তা স্থির করে। কোনো আর্থিক বছরে সরকার কত টাকা ব্যয় করবে এবং কোন্ কোন্ উৎস থেকে কত টাকা সংগৃহীত হবে এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাবলি পার্লামেন্টে উপস্থিত করতে হয়।

প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিজস্ব মত প্রকাশের স্থল হলো পার্লামেন্ট।

লোকসভার ক্ষমতা ঃ

ক) কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। অর্থবিল এবং অন্যান্য সাধারণ বিল লোকসভা উপস্থাপন ও কার্যকর করে।

খ) আর্থিক বছরের জন্য বাজেট, বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন এবং কর সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে।

গ) বিভিন্ন প্রশ্নাবলি, সম্পূরক প্রশ্নাবলি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে লোকসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ঘ) রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন করে।

রাজ্যসভার ক্ষমতা ঃ

ক) অন্যান্য সাধারণ বিল অনুমোদন করে এবং অর্থ বিলে সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারে।

খ) সংবিধান সংশোধন অনুমোদন করে।

গ) বিভিন্ন প্রশ্নাবলি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আস্থা কিংবা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে রাজ্যসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ঘ) রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ঃ

অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে উত্থাপন করা যায়। অর্থবিল একমাত্র লোকসভায় উপস্থাপন করা যায়। লোকসভায় পাশ হলে বিলটি রাজ্যসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

বিভিন্ন কমিটিগুলোতে এই বিলের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়। কমিটির সুপারিশগুলো পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। এটি আইন প্রনয়ণের দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় এবং সর্বশেষ পযায়ে বিলের উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল কোনো একটি কক্ষে পাশ হওয়ার পর অন্য কক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হয়। এক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য থাকলে সমাধানের জন্য সংসদের যুগ্ম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়।

যদি এটি অর্থবিল হয় তাহলে রাজ্যসভা হয় একে অনুমোদন করে নতুবা সংশোধনের পরামর্শ দেয়। কিন্তু অর্থবিলকে রাজ্যসভা কখনোই বাতিল করতে পারে না। ১৪ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই বিলটি পাশ হয়ে যায়। অর্থ বিলের উপর রাজ্যসভার সংশোধনের প্রস্তাব লোকসভা গ্রহণ কিংবা বর্জন উভয়ই করতে পারে।

কোনো বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করতে হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণ ঃ

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভা বিভিন্নভাবে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক) **আলোচনা, পর্যালোচনা, বিতর্ক :** আইন প্রণয়নের সময় অইনসভার সদস্যগণের কাছে সরকারের নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং কীভাবে এগুলো বাস্তবায়িত করা হবে তার উপায় সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বির্তকের সুযোগ থাকে। বিল সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি অন্যান্য আলোচনার মাধ্যমে ও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

খ) **আইনের অনুমোদন এবং আনুষ্ঠানিক সম্মতিজ্ঞাপন :** পার্লামেন্টের অনুমোদন পেলেই কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে কোনো আইন পাশ করা সরকারের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। দল এবং জোটভুক্ত সদস্যদের সাথে দর কষাকষি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের চেষ্ঠা করে।

গ) **অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ :** বাজেট প্রণয়ন ও আইনসভার অমুমোদনের জন্য পেশ করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব। লোকসভা প্রয়োজনে বাজেট প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের বিবৃতি দাবি করতে পারে। এছাড়া পাবলিক একাউন্ট কমিটি এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি ও অপব্যবহারের ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারে। এইভাবে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইনসভা সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

শাসন বিভাগকে জনগণের প্রতি দ্বায়বদ্ধ করে তুলতে আইনসভার হাতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র হল অনাস্তা প্রস্তাব। ১৯৮৯ সালের পরে সংখ্যাগরিষ্টতার অভাবে বেশ কয়েকটি সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্তা প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সরকারের পতন ঘটে।

গঠনগত দিক থেকে আইন বিভাগ সরকারের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রতিনিধিমূলক। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আইনসভা অনেক বেশি কার্যকরী ও জনকল্যাণমুখী হয়ে উঠে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- ১ X ১ = ১

১) সংবিধানের কত নং ধারায় পার্লামেন্টের কথা উল্লেখ আছে?

(ক) ৮০ নং, (খ) ৭৯ নং, (গ) ৮২ নং, (ঘ) ৮১ নং।

উঃ- (খ) ৭৯ নং।

২) ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষের নাম কী?

(ক) লোকসভা, (খ) রাজ্যসভা, (গ) বিধান সভা, (ঘ) বিধান পরিষদ।

উঃ- (খ) রাজ্যসভা।

৩) অর্থবিল সংসদের কোন্ কক্ষে পেশ করতে হয়?

(ক) লোকসভা, (খ) রাজ্যসভা, (গ) বিধানসভা, (ঘ) সুপ্রীম কোর্ট।

উঃ- (ক) লোকসভা।

৪) ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে মোট কতজন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করতে পারেন?

(ক) ১২ জন, (খ) ২ জন, (গ) ১৪ জন, (ঘ) ১৫ জন।

৫) সংবিধানের কত নং ধারায় সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে?

(ক) ৪৪, (খ) ৮৪, (গ) ৮৯, (ঘ) ৭৯।

৬) লোক সভায় বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ৫৪৫ জন, (খ) ৫৪৩ জন, (গ) ২৫০ জন, (ঘ) ২৩৮ জন।

৭) রাজ্যসভা অর্থবিলকে সর্বাধিক কতদিন আটকে রাখতে পারে?

(ক) ১০ দিন, (খ) ১২ দিন, (গ) ১৪ দিন, (ঘ) ১ মাস।

৮) বিধানসভার নেতা কে?

(ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) মুখ্যমন্ত্রী, (গ) রাষ্ট্রপতি, (ঘ) রাজ্যপাল।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 1 X 1 = 1

১) ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ কত?

২) রাজ্য সভায় কে সভাপতিত্ব করেন?

৩) লোক সভার সভাপতিকে কী বলা হয়?

৪) রাজ্য সভার সদস্যদের ন্যূনতম বয়স কত হতে হয়?

৫) রাজ্য সভার কত জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কতৃক মনোনীত হন?

৬) ভারতের কোন রাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সদস্য লোকসভায় যায়?

৭) লোক সভায় বর্তমান স্পীকার কে?

৮) ত্রিপুরা বিধানসভার বর্তমান স্পীকারের নাম কী?

৯) ত্রিপুরা থেকে মোট কতজন সদস্য সংসদে নির্বাচিত হন?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো ঃ- 2 **X** 1 = 2

১) লোক সভা কীভাবে গঠিত হয়?

২) রাজ্য সভা কীভাবে গঠিত হয়?

৩) লোক সভার সদস্যদের যোগ্যতাসমূহ লেখো।

৪) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে এমন দুটি রাজ্যের নাম লেখো।

৫) অনাস্থা প্রস্তাব বলতে কী বোঝ?

৬) সরকারি বিল ও বেসরকারি বিলের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

৭) স্ট্যান্ডিং কমিটি কাকে বলে?

৮) 'জিরো আওয়ার' বলতে কী বোঝায়?

৯) অর্থ বিল কাকে বলে?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো ঃ- 4 **X** 1 = 1

১) লোকসভা ও রাজ্য সভার মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখো।

২) ভারতের পার্লামেন্টের চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি আলোচনা করো।

৩) পার্লামেন্টের আইন তৈরির প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৪) লোকসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্ষেপে লেখো।

৫) রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্ষেপে লেখো।

৬) পার্লামেন্ট কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। অনেকসময় দেখা যায় ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিবাদ মিমাংসার ক্ষেত্রে আদালতগুলো সালিসির ভূমিকা পালন করে। আমাদের অধিকারগুলো সংরক্ষণেও বিচার বিভাগ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমাদের কেন স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রয়োজন ?

যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে গোষ্ঠীর কিংবা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকারের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ঘটে থাকে। একটি স্বাধীন বিচার ভিাগ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট আইনের অনুসরণে এই সকল বিবাদের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হলো - ধনী, দরিদ্র, পুরুষ-মহিলা এবং উন্নত-অনুন্নত শ্রেণির সকল নাগরিকই একই আইনের অধীন। বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ হলো আইনের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এটি নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করে, নির্দিষ্ট আইন অনুসরণে বিবাদের মীমাংসা করে এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতার অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা - সহজ কথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো -

- সরকারের আইন ও শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
- সরকারের অন্য বিভাগগুলো যাতে কোনোভাবেই বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে না পারে।
- বিচারকগণ ভয়মুক্ত পরিবেশে নিরপেক্ষভাবে যাতে কাজ করতে পারে, সে ধরনের পরিবেশ গড়ে তোলা।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা - ভারতীয় সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো -

i) সংবিধান অনুযায়ী বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন বিভাগ যুক্ত থাকে না। ফলে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ থাকে না।

ii) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচারপতিদের কার্যকালের দায়িত্ব একান্ত প্রয়োজন। এ কারণে ভারতীয় সংবিধানে বিচারপতিদের অপসারণের জন্য অত্যন্ত জটিল পদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

iii) বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধার জন্য বিচার বিভাগকে সরকারের আইন ও শাসন বিভাগের উপর নির্ভর করতে হয় না। সংবিধান অনুযায়ী বিচারকদের বেতন, ভাতা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার জন্য আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন নেই।

iv) বিচারকদের কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত ব্যক্তিগত সমালোচনার উর্ধ্বে থাকে। এমনকি আদালত অবমাননার জন্য দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা আদালতের আছে প্রভৃতি।

বিচারপতিদের নিয়োগ - ভারতের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধানত সুপ্রিমকোর্টের বয়োজ্যেষ্ঠ বিচারপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।

বিচারপতিদের অপসারণ - সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও অভব্যতা এবং সংবিধান ভঙ্গের মতে গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের অপসারণ করা যায়। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি গৃহীত হলে অভিযুক্ত বিচারপতি অপসারিত হন। একে ইমপিচমেন্ট বা মহাবিচার বলে।

বিচার বিভাগের গঠন কাঠামো ঃ

সংবিধান অনুযায়ী ভারতে সুসংহত ও অখন্ড বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এর অর্থ অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতবর্ষের অঙ্গারাজ্যগুলোর জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থা নেই। ভারতে দ্বৈত বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে একক ও অখন্ড বিচার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ভারতের বিচার ব্যবস্থার গঠন প্রণালী অনেকটা পিরামিডের মতো। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে সুপ্রিমকোট, মধ্যবর্তী স্তরে আছে হাইকোর্ট এবং সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে জেলা ও অন্যান্য অধস্তন আদালতসমূহ। অধস্তন আদালতগুলো উচ্চ অদালতের তত্ত্বাবধানে নিজেদের কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ঃ

পৃথিবীর আদালতসমূহের মধ্যে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট একটি অন্যতম শক্তিশালী আদালত। সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতাধীন এলাকাগুলো হল-

a) মূল এলাকা ঃ সংবিধানে ১৩১নং ধারা অনুসারে (i) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দিলে; (ii) কেন্দ্রীয় সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দিলে, এবং (iii) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারে মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা সুপ্রিমকোর্ট মীমাংসা করে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা [৭১(১) নং ধারা]।

b) আপিল এলাকা ঃ ভারতে অখন্ড বিচার ব্যবস্থার ফলে সুপ্রিমকোর্ট হল দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। সুপ্রিমকোর্টের আপিল এলাকা চার ভাগে বিভক্ত।

i) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল

ii) দেওয়ানি আপিল

iii) ফৌজদারী আপিল এবং

iv) বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল।

c) পরামর্শদান এলাকা ঃ

দুটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন। (a) রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো আইন ও তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বা হবে, তাহলে তিনি এ বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শদানে বাধ্য হয়। আবার রাষ্ট্রপতিও এই পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য হয়। (ধারা ১৪৩(১))

(b) সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি, সনদ, অঙ্গীকারপত্র যা সংবিধান চালু হওয়ার পরও কার্যকরী আছে, এমন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।

d) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করা ঃ সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলো (১৪-৩২নং ধারা) সংরক্ষণের জন্য জনগণ সুপ্রিমকোর্টের কাজে আবেদন করতে পারে। তার পরিপেক্ষিতে ৩২নং ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট এবং ২২৬ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্ট বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ ইত্যাদি ৫ প্রকারের লেখ জারি করতে পারে।

বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা ঃ

বর্তমানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত আলোচনায় বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা এবং জনস্বার্থ মামলা এই দুটি শব্দ প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হল জনস্বার্থ মামলা বা সামাজিক স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মামলা। সাধারণ অবস্থায় একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সুবিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হয়ে থাকে। ১৯৭৯ সালে আদালত ঘোষণা করে শুধু ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নন, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে অন্য কেউ আদালতে মামলা করতে পারে। এই সকল ঘটনায় জনগণের স্বার্থ যুক্ত থাকলে আদালত জনস্বার্থ মামলা হিসাবে গ্রহণ করে।

বিচার বিভাগ এবং অধিকারসমূহ ঃ

বিচার বিভাগ ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথমত - সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুসারে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, অধিকারপৃচ্ছা ইত্যাদি লেখ জারি করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। হাইকোর্টগুলো ও সংবিধানের ২২৬নং ধারা অনুসারে বিভিন্ন লেখ জারি করে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত - সংবিধানের ১৩নং ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করতে পারে।

বিচারবিভাগ এবং পার্লামেন্ট ঃ

নাগরিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে সক্রিয়তা প্রদর্শনের পাশাপাশি আদালত রাজানৈতিক দলগুলোর অসাংবিধানিক কাজকর্ম বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এভাবে বিচারবিভাগের পুনর্বিবেচনার বাইরে ও রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের কার্যকলাপের পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা ও আদালতের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

সরকারে প্রতিটি বিভাগের স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আইন, শাসন ও বিচারবিভাগের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিরোধের সৃষ্টি হয়। পার্লামেন্ট ও আদালতের বিরোধের মূল কারণ ছিল-

- ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সীমানা কতটুকু?

- মৌলিক অধিকারের সংকোচন ও বাতিল করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতা কতটুকু?
- সংবিধান সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টের ক্ষমতা কতটুকু? ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় ভারতের বিচারবিভাগ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিচার বিভাগ সংবিধানের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দান করে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- ১ X ১ = ১

১) সংবিধানের কত নং ধারায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপনের কথা বলা হয়েছে?

(ক) ১২৩ নং ধারা (খ) ১২৪ নং ধারা (খ) ১২৫নং ধারা (ঘ) ১২৬ নং ধারা

উঃ- (খ) ১২৪ নং ধারা

২) ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী?

(ক) সুপ্রীম কোর্ট, (খ) হাইকোর্ট, (গ) জেলা কোর্ট, (ঘ) নগর ও দায়রা আদালত।

উঃ- (ক) সুপ্রীম কোর্ট।

৩) সুপ্রীম কোর্টের মোট বিচারপতির সংখ্যা কত?

(ক) ৩২, (খ) ৩৩, (গ) ৩৪, (ঘ) ৩১।

উঃ- (গ) ৩৪।

৪) ত্রিপুরা হাইকোর্ট কবে চালু হয়?

(ক) ২৩ মার্চ ২০১২, (খ) ২৩ মার্চ ২০১৩, (গ) ২৩ মার্চ ২০১৪, (ঘ) ২৩ মার্চ ২০১৫।

৫) স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কবে স্থাপিত হয়?

(ক) ২৮ জানুয়ারী ১৯৫০, (খ) ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০,

(গ) ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯, (ঘ) ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯।

৬) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে কে নিয়োগ করেন?

(ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) আইনমন্ত্রী, (গ) রাষ্ট্রপতি, (ঘ) স্পীকার।

৭) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স কত?

(ক) ৬০ বছর, (খ) ৬৫ বছর, (গ) ৬২ বছর, (ঘ) ৭০ বছর।

৮) বর্তমানে ভারতে হাইকোর্টের সংখ্যা কত?

(ক) ২২টি, (খ) ২৩টি, (গ) ২৫টি, (ঘ) ২৭টি।

৯) জেলা জজকে কে নিয়োগ করেন?

(ক) রাষ্ট্রপতি, (খ) রাজ্যপাল, (গ) সুপ্রীমকোর্ট, (ঘ) হাইকোর্ট।

১০) সুপ্রীম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতির নাম কী?

(ক) ফতেমা বিবি, (খ) মীরা কুমারী, (গ) সরোজীনি নাইডু, (ঘ) প্রতিভা পাতিল।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 2 **X** 1 = 2

১) মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কয় ধরনের লেখ জারি করতে পারে ও কী কী?

২) বশী প্রত্যক্ষীকরণের অর্থ কী?

৩) পরমাদেশ বলতে কী বোঝ?

৪) লোক আদালত বলতে কী বোঝ?

৫) প্রতিষেধ কথাটির অর্থ কী?

৬) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে নিয়োগ করা হয়?

৭) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে অপসারণ করা যায়?

৮) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে নিয়োগ করা হয়?

৯) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতাগুলো কী কী?

১০) হাইকোটের বিচারপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতাগুলো কী কী?

১১) আমাদের কেন স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রয়োজন?

১২) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

১৩) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার দুটো উপায় লেখো?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো ঃ- 6 **X** 1 = 6

১) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

২) ভারতের হাইকোর্টের যে কোনো ছয়টি কার্যাবলি বর্ণনা করো।

৩) ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ছয়টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় মতবাদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় মতবাদ :

যুক্তরাষ্ট্র হল এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক। এর একটি হল, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ও অপরটি হল জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি স্তরের সরকার হবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষমতা সম্পন্ন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর জনগণ দুই ধরনের পরিচিতি ও দায়িত্ব বহন করে। এরা একদিকে যেমন আঞ্চলিক তথা প্রাদেশিক, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ। এই দুই ধরনের সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে সুনির্দিষ্ট থাকে।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি :

দেশভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর গণপরিষদের সদস্যগণ স্থির করেন যে, স্বাধীন ভারত সরকার গড়ে উঠবে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও পারস্পারিক সহযোগিতার নীতির মাধ্যমে। এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বন্টন নির্দিষ্ট থাকবে। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক। এইভাবে ভারতীয় সংবিধান এদেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেছে।

ক্ষমতা বণ্টন :

ভারতীয় সংবিধানে দুই ধরনের সরকার বর্তমান। যেমন- সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যগুলোর জন্য আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার। উভয় সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধানে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ আছে। কোন্ ক্ষমতাটি কোন্ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এ নিয়ে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে বিচার বিভাগ সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তার মীমাংসা করে থাকে।

ভারতীয় সংবিধান

ক্ষমতা বণ্টনের তালিকা

কেন্দ্রীয় তালিকায় অর্ন্তভুক্ত বিষয়সমূহ	রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ	যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ
→ প্রতিরক্ষা	→ কৃষি	→ শিক্ষা
→ পারমাণবিক শক্তি	→ পুলিশ	→ বন
→ পররাষ্ট্র	→ কারাগার	→ দত্তক ও উত্তরাধিকার
→ যুদ্ধ ও শান্তি, ইত্যাদি	→ স্থানীয় সরকার, ইত্যাদি	→ শ্রমিক সংগঠন, ইত্যাদি

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার :

ভারতীয় সংবিধানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ বিশ্বাস করতেন

যে, ভারতবর্ষে এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রয়োজন, যার দ্বারা সকল জাতি গোষ্ঠী স্বীকৃতি লাভ করবে। তারা চাইতেন কেন্দ্রীয় সরকার হবে অধিক শক্তিশালী। কারণ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অনৈক্য দূরীভূত করে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ঃ

কতকগুলো সাংবিধানিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে।

♦ পার্লামেন্ট কোনো রাজ্যকে নতুন একটি রাজ্য গঠন করতে পারে, কিংবা দুই বা ততোধিক রাজ্য একত্রিত করে নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে। এছাড়াও পার্লামেন্ট কোনো রাজ্যের নাম ও সীমানা পরিবর্তন করতে পারে।

♦ সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কতগুলো জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা অর্পণ করেছে। এই জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে রাজ্যগুলোর স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে।

♦ স্বাভাবিক অবস্থাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত। রাজ্যগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় অনুদান ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

♦ রাজ্যপালের হাতে এমন বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, যার দ্বারা তিনি রাজ্য সরকার এবং রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। এমন কি স্বাভাবিক অবস্থাতেও বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনো বিলকে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য স্থগিত রাখতে পারেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মতবিরোধ ঃ

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারগুলোর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবে রাজ্যগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজের স্বাধিকার বজায় রেখে সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় শাসন মেনে নেয়। এই অবস্থায় রাজ্যগুলো নিজেদের জন্য বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঃ

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য ছিল। একমাত্র নতুন রাজ্য গঠনের বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়েই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পায় এবং বিভিন্ন রাজ্যে অ-কংগ্রেসী দল ক্ষমতা দখল করে। এর ফলে রাজ্যগুলোর পক্ষে অধিক ক্ষমতা ও স্ব-শাসনের দাবী জোরালো হয়। অবশেষে ১৯৯০ এর দশকে ভারতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্যের অবসান হলে জোট রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে (বিশেষ করে কেন্দ্রে)। রাজ্যগুলোতে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দল ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়। এর ফলে প্রাদেশিক রাজ্যগুলো আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং উন্নত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার জন্য অধিক ক্ষমতার দাবি করতে থাকে।

স্বায়ত্ব শাসনের দাবি ঃ

১। কোনো কোনো সময় দাবি উঠে সংবিধান স্বীকৃত ক্ষমতা বিভাজন নীতির পরিবর্তন করে রাজ্যগুলোর হাতে অধিক স্ব-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

২। অন্য আরেকটি দাবি ছিল রাজস্ব আদায় ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা থাকা উচিত।

৩। রাজ্যপ্রশাসনের কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের ঘটনায় রাজ্যগুলো বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিল।

৪। সংস্কৃতি ও ভাষাগত বিষয়েও রাজ্যগুলো অধিক স্বায়ত্ত্বশাসন দাবি করে, প্রভৃতি।

রাজ্যপালের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রপতি শাসন ঃ

রাজ্যপালের ভূমিকা অনেক সময় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে। রাজ্যপালগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যপাল রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত কিংবা রাজ্যবিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও (১৯৫৯ সালে কেরালায়) রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ না নিয়েই রাজ্যসরকারকে বরখাস্ত করেন। ১৯৬৭ সালে ও অনুরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলো সুপ্রিমকোর্টে মামলা করে এবং সুপ্রিমকোর্ট এই মর্মে রায় দান করে যে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সংবিধানিক বৈধতা বিচার বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

নতুন রাজ্যের দাবি ঃ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধের অপর একটি কারণ হল - নতুন রাজ্য গঠনের দাবি। স্বাধীনতার পর ভাষাকে ভিত্তি করে নতুন রাজ্য গঠনের দাবি উঠতে থাকে। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং ২০০০ সালে ছত্রিশগড়, উত্তরাখন্ড ও ঝাড়খন্ড গঠিত হয়।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধ ঃ

রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য দুটি বিষয় যুক্ত।

প্রথমটি হল, সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ। বেলঁগাও শহরের দাবি নিয়ে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত বিরোধ বর্তমান। রাজধানী চন্ডিগড়ের দাবি নিয়ে ও পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

দ্বিতীয়টি হল, জলবন্টন সংক্রান্ত বিরোধ। তামিলনাড়ু ও কর্নাটক রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধের অন্যতম বিষয় কাবেরী নদীর জল বন্টন। এছাড়া নর্মদা নদীর জলবন্টন নিয়ে ও গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চলছে।

বিশেষ ব্যবস্থা ঃ

সংবিধানে ছোটো রাজ্যগুলোর জন্য ন্যূনতম প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৩৭১নং ধারা অনুসারে আসাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পৃথক ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর ঃ

সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে-

ক) কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকায় অন্তভুক্ত কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের সম্মতির প্রয়োজন।

খ) অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় জম্মু ও কাশ্মীর যে বিষয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করে সেটি হল, রাজ্যের অনুমতি ছাড়া অভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যায় না।

গ) সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা সংশোধনের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের সম্মতি নেওয়া আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়- যুক্তরাষ্ট্র একটি রামধনুর মতো, এর প্রতিটি রঙ স্বতন্ত্র। যদিও সবকটা রঙ একত্রে মিলিত হয়ে একটি অপরূপ রামধনুর সৃষ্টি করে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- ১ X ১ = ১

১) ওয়েষ্ট ইন্ডিজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কবে হয়?

(ক) ১৯৫৭, (খ) ১৯৫৮, (গ) ১৯৫৯, (ঘ) ১৯৬০।

উঃ- (খ) ১৯৫৮।

২) ভারতের কেন্দ্রীয় তালিকায় কয়টি বিষয় রয়েছে?

(ক) ৫২টি, (খ) ৬৬টি, (গ) ৭৯ টি, (ঘ) ৭৬টি।

৩) ভারত কতগুলো বিষয়কে রাজ্য তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে?

(ক) ৫২টি, (খ) ৯৭টি, (গ) ৬৬টি, (ঘ) ৪৭টি।

৪) সংবিধানের কত নং ধারায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা ভূক্ত করা হয়েছে?

(ক) ২৪৬ নং ধারা,(খ) ২৪৭ নং ধারা, (গ) ২৪৮ নং ধারা, (ঘ) ২৪৯ নং ধারা।

৫) ভারতে বর্তমানে কতগুলো যুগ্মতালিকাভূক্ত বিষয় রয়েছে?

(ক) ৬৬টি, (খ) ৪৭টি, (গ) ৯৭টি, (ঘ) ৪২টি।

৬) কোন বিষয়গুলো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ দিতে পারে?

(ক) কেন্দ্র তালিকা, (খ) রাজ্য তালিকা, (গ) যুগ্মতালিকা, (ঘ) সব বিষয়ে।

৭) সংবিধানের কত নং ধারায় রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করা যায়?

(ক) ৩৫২, (খ) ৩৫৬, (গ) ৩৬০, (ঘ) ৩৭০।

৮) সম্প্রতি কোন্ রাজ্য থেকে ৩৭০ নং ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে?

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশ, (খ) জম্মু-কাশ্মীর, (গ) নাগাল্যান্ড, (ঘ) সিকিম।

৯) ভারতে সর্বশেষ কোন রাজ্যটি তৈরি হয়েছে?

(ক) তেলেঙ্গানা, (খ) সিকিম, (গ) মনিপুর, (ঘ) ঝাড়খন্ড।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 2 X 1 = 2

১) রাজ্যপালের দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো।

২) যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩) ভারতের নতুন রাজ্যগুলোর দাবী কিসের ভিত্তিতে উঠতে থাকে?

৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলতে কী বোঝ?

৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দুটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 4 X 1 = 4

১) ভারতের রাষ্ট্রপতির শাসন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

২) ভারতের কেন্দ্র রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতিটি আলোচনা করো।

৩) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্টগুলো আলোচনা কর।

৪) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল অঙ্গারাজ্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

অষ্টম অধ্যায়

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার কেন ?

স্থানীয় সরকার বলতে গ্রাম এবং জেলা স্তরের সরকারকে বোঝায়। এরূপ সরকারের অবস্থান জনগণের খুব কাছাকাছি। সরকার বিশ্বাস করে যে, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উপাদান হল স্থানীয় স্বার্থ এবং সাধারণ জনগণের অভিজ্ঞতা। এর ফলে জনগণ খুব দ্রুত ও স্বল্প খরচে সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় সরকারের সাহায্য নিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় সরকার জনগণের স্বার্থ রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ভারতে স্থানীয় সরকারের অগ্রগতি ঃ

প্রাচীনকাল থেকে গ্রামীণ আড্ডা বা সভার মধ্যে ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন সরকারের উপস্থিতি ছিল বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। কালক্রমে এই গ্রামীণ সভাগুলো পঞ্চায়েতে (পাঁচজনের সভা) রূপান্তরিত হয়। এইরূপ পঞ্চায়েতগুলো গ্রামীণ সমস্যা সমাধান করে। কালের বিবর্তনে এই পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও কার্যাবলির প্রভূত পরিবর্তন ঘটে।

আধুনিকযুগে ১৮৮২ সালের পর নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের সৃষ্টি হয়। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন অনুসরণ করে সরকার বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রতিষ্ঠার পরেও এর অগ্রগতি চলতে থাকে।

স্বাধীন ভারতে স্থানীয় সরকার ঃ

৭৩ এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের পর ভারতে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়টি নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু এর আগে স্থানীয় সরকারগুলোকে আরো বেশি কার্যকরী করার কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, প্রথমত, ১৯৫২ সালে গৃহীত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উন্নয়ণমূলক পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ১৯৬০ সালে গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৯৮৭ সালের পর স্থানীয় সরকারের কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে পি. কে. থুনগং কমিটি স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন সংস্থাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতির সুপারিশ করে। ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানে দুটি সংশোধন করে। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশে স্থানীয় সরকারগুলোর গঠন প্রকৃতি ও কার্যাবলির মধ্যে সমতা বিধান করে স্বায়ত্ত্ব শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

৭৩ তম এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন ঃ

১৯৯২ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট সংবিধানের ৭৩ তম এবং ৭৪ তম সংশোধন করে। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনটি ছিল গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সম্পর্কে। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনটি শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত। ৭৩ তম এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন ১৯৯৩ সালে কার্যকর হয়।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধন ঃ

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থার যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলো হলো —

ক) ত্রিস্তরীয় কাঠামো ঃ ভারতের তিনটি রাজ্যে ত্রিস্তরীয় কাঠামো বর্তমান। সর্বনিম্ন স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি বা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত। মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে মন্ডল (ত্রিপুরায় একে পঞ্চায়েত সমিতি বলে)। গ্রামীণ এলাকায় সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জেলা পঞ্চায়েত (ত্রিপুরায় জেলা পরিষদ)।

খ) নির্বাচন ঃ পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থার তিনটি স্তরের প্রতিনিধিরাই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। পঞ্চায়েত সংস্থার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর।

গ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত (ত্রিপুরায় ৫০ শতাংশ)। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

ঘ) বিষয়সমূহের স্থান পরিবর্তন ঃ রাজ্য তালিকাভুক্ত ২৯টি বিষয় সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের একাদশ তপশিলভুক্ত তালিকায় অন্তভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে এই বিষয়গুলো পঞ্চায়েতরাজ সংস্থার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হল কৃষি, পানীয় জল, রাস্তা ও সুরঙ্গাপথ, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ণ, শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক), বাজার ও মেলা, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঃ

রাজ্য সরকার রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের জন্য একাদশ কমিশনার নিযুক্ত করবেন, যার উপর পঞ্চায়েতিরাজ সংস্থার নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। পূর্বে এই বিষয়টি পরিচালনা করতেন রাজ্য সরকারের অধীন রাজ্যপ্রশাসন।

রাজ্যের অর্থ কমিশন ঃ

রাজ্য সরকার পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের অর্থ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন একদিকে যেমন রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে রাজস্ব বন্টনের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামীণ ও শহরের স্বায়ত্ত্ব শাসন সংস্থার আর্থিক বিষয়টি ও পর্যালোচনা করে।

৭৪ তম সংবিধান সংশোধন ঃ

শুধুমাত্র শহরগুলোতে আইনটি প্রযুক্ত হবে, ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের এই বিষয়টি বাদ দিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের পুনরাবৃত্তি। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনে উল্লেখিত বিষয়গুলো যেমন, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সংরক্ষণ, তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহের স্থানান্তর, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য অর্থ কমিশন ইত্যাদি ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনে নগর পালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের হাতে আধিক ক্ষমতা অর্পণ। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্য শুধু সাংবিধানিক আইন নয়, এর প্রকৃত

বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল।

নীচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ- 1 X 1 = 1

১) ভারতের স্থানীয় সরকারের জনক কাকে বলা হয়?

(ক) লর্ড মায়ো, (খ) লর্ড রিপন, (গ) লর্ড কার্জন, (ঘ) মহাত্মা গান্ধী।

উঃ- (খ) লর্ড রিপন।

২) পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার কথা সংবিধানের কত নং ধারায় প্রথম বলা হয়েছিল?

(ক) ১৯ নং, (খ) ২০ নং, (গ) ৪০ নং, (ঘ) ২৪৩ নং।

উঃ- (গ) ৪০ নং।

৩) বর্তমান পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে লাগু হয়েছে?

(ক) ৭৩ তম, (খ) ৭৪ তম, (গ) ৭৫ তম, (ঘ) ৬৩ তম।

৪) একজন পঞ্চায়েত সদস্যের ন্যূনতম বয়স কত হওয়া প্রয়োজন?

(ক) ১৮ বছর, (খ) ২১ বছর, (গ) ২৫ বছর, (ঘ) ৩০ বছর।

৫) ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কবে প্রথম চালু হয়?

(ক) ১৯৫৭ খ্রীঃ, (খ) ১৯৫৮ খ্রীঃ, (গ) ১৯৫৯ খ্রীঃ, (ঘ) ১৯৬০ খ্রীঃ।

৬) ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ব্লক স্তরের ব্যবস্থাকে কী বলা হয়?

(ক) জেলা পরিষদ, (খ) পঞ্চায়েত সমিতি, (গ) গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঘ) গ্রাম সভা।

৭) বর্তমানে কোন্ রাজ্যে এখনো পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা চালু হয়নি?

(ক) আসাম, (খ) সিকিম, (গ) নাগাল্যান্ড, (ঘ) মণিপুর।

৮) গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন?

(ক) ৫ বছর, (খ) ৬ বছর, (গ) ১০ বছর, (ঘ) ৩ বছর।

৯) বর্তমানে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ৩৫ জন, (খ) ৪০ জন, (গ) ৪৯ জন, (ঘ) ৫০ জন।

১০) ত্রিপুরার বর্তমানে কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে?

(ক) ৫১১ টি, (খ) ৫৯১ টি, (গ) ৬১১ টি, (ঘ) ৬৯১ টি।

নীচের প্রশ্নগুলোর এক কথায় উত্তর দাও ঃ- 1 X 1 = 1

১) B.D.O এর পুরো নাম কী?

২) গ্রাম সভার একটি কাজ লেখো।

৩) জেলা পরিষদের সভাপতিকে কী বলা হয়?

৪) ন্যায় পঞ্চায়েত কী?

৫) পঞ্চায়েত নির্বাচন ব্যবস্থায় দায়িত্বে কে আছেন?

৬) ত্রিপুরাতে মোট কয়টি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে?

৭) আগরতলা মিউনিসিপল কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়রের নাম কী?

৮) স্থানীয় সরকার কী?

৯) ভারতে স্থানীয় সরকারের জনক কাকে বলা হয়?

১০) ভারতের কোন্ রাজ্যে প্রথম পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার সূচনা হয়?

১১) সংবিধানের একাদশ তালিকার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়ের নাম করো।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করো ঃ- 4 X 1 = 4

১) তুমি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়ার সুযোগ পেলে এলাকার জন্য কী কী কাজ করবে?

অথবা

গ্রাম পঞ্চায়েতর কয়েকটি কাজ লেখো।

২) সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩) সংবিধানের ৭৪তম সংশোধনটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪) স্থানীয় সরকার কেন প্রয়োজন সংক্ষেপে টিকা লেখো।

৫) পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলি বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায়

সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল

সংবিধান কী স্থিতিশীল ?

যেকোনো সমাজেই সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্বে যারা থাকেন, তাদের একটি সাধারণ সমস্যার সমুখীন হতে হয়। সংবিধান প্রস্তুত করার সময় সমাজ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, স্বভাবতই সেগুলোর সমাধান সূত্র সংবিধানে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ঠিক একইভাবে ভবিষ্যৎ সরকার পরিচালনার কাঠামো কেমন হবে, তার রূপরেখা অবশ্যই সাংবিধানিক দলিলে উল্লেখ থাকতে হবে। সুতরাং সংবিধানকে অবশ্যই ভবিষৎ সমস্যা সমাধানের উপযোগী হতে হয়।

ভারতের সংবিধান প্রনেতাগণ এই সকল সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তারা সংবিধানকে সাধারণ আইনের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উক্ত দলিলকে সম্মান প্রদর্শন করবে। একইভাবে তারা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই দলিলের সংশোধন বা পরিমার্জন হতে পারে।

সংবিধান সংশোধনী পদ্ধতি ঃ

সংবিধানে এমন অনেক ধারা রয়েছে যেগুলো পার্লমেন্টে সাধারণ আইনের মাধ্যমে সংশোধন করা যায়। এগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না এবং এক্ষেত্রে সাধারণ আইন ও সংশোধিত আইনের মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। সংবিধানের এই অংশগুলো অত্যন্ত নমনীয়।

সংবিধানের অবশিষ্ট অংশ সংশোধনের জন্য ৩৬৮ নং ধারার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে সংবিধানের এই অংশের সংশোধনের জন্য দুটো পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হল পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সম্মতিক্রমে সংবিধানের এই অংশের সংশোধন করা যায়। অপর পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল। এই পদ্ধতি অনুসারে পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকাংশ এবং রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অর্ধেকের সম্মতির প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য যে, সংবিধানের সকল সংশোধনই পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে হয়ে থাকে।

অন্য সকল বিলের মতোই সংশোধিত বিল ও রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিলটি পুনঃবিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন না।

এত বেশি সংশোধন কেন ?

২০১৯ সালে জানুয়ারী মাসে ভারতের সংবিধান ৬৯ বছর পূর্ণ করেছে। এই ৬৯ বছরের মধ্যে এটি ১০৩ বার সংশোধন করা হয়েছে এবং এখনো সংশোধন সংক্রান্ত অনেক বিল বিবেচনাধীন রয়েছে। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর প্রথম দশকটি ছাড়া প্রতিটি দশকেই বিপুল সংখ্যক সংশোধনের সাক্ষী রয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে ও সময়ের প্রয়োজনে সংশোধন আবশ্যক।

এই পর্যন্ত প্রণীত সংশোধনের বিষয়বস্তু ঃ

বিশাল সংখ্যক সংশোধনের বিষয়বস্তুগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে এমন সংশোধন সমূহ যেগুলোর প্রকৃতি প্রশাসনিক ও প্রয়োগিক এবং যেগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মূল সংবিধানের ধারায় ব্যাখ্যাকরণ, স্পষ্টীকরণ এবং এক্ষেত্রে শুধু সাধারণ সংশোধনই যথেষ্ট। এভাবে হাইকোর্টের বিচারপতিদের অবসরকাল ৬০ বছর থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে (১৫ তম সংশোধনীতে)। একইভাবে হাইকোট এবং সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হয় (৫৫তম সংশোধনীতে)।

বিভিন্ন ব্যাখ্যা ঃ

সংবিধানের একটি বিরাট অংশের সংশোধন আসলে সরকার এবং বিচারবিভাগের বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফসল। যখন কোনো বিষয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তখন পার্লামেন্ট তা সমাধানের জন্য সংবিধানের সেই সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাখ্যার সংশোধন করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে পার্লামেন্ট বিচার বিভাগের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা অতিক্রম করার জন্য খুব ঘন ঘন সংবিধান সংশোধন করেছে।

রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংশোধন ঃ

রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংবিধানের বিশাল সংখ্যক সংশোধন করা হয়েছে। কারণ সমাজের আশা আকাঙ্খা এবং রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন অনেকগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে। ১৯৮৪ সালের পর অনেক সংশোধনের ক্ষেত্রেই এ ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে।

বিতর্কিত সংশোধন ঃ

১৯৭০-৮০ দশকে এক বিরাট সংখ্যক সংশোধন আইনগত ও রাজনৈতিক বিতর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছে। এই সময়ে যারা বিরোধী দলে ছিলেন (১৯৭১-৭৬) তারা মনে করতেন সংবিধানে বেশিরভাগ সংশোধনই ছিল সংবিধানের আদর্শ বিরোধী। বিশেষ করে ৩৮,৩৯ এবং ৪২তম সংশোধনের অনেক অংশই বিতর্কিত। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার ঘোষণার পটভূমিকায় এই তিনটি সংশোধনী সংগঠিত হয়েছিল।

মূল কাঠামো ও সংবিধানের বিবর্তন ঃ

বিচার বিভাগ বিখ্যাত কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতা লাভ করে। এই বিষয়টি ভারতীয় সংবিধানের বিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করেছে।

→ এটি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করেছে। এখনে বলা হয়েছে যে কোনো সংশোধনই সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

→ এটি পার্লামেন্টকে সংবিধানের সকল অংশের যে কোনো ধরনের সংশোধনের অনুমতি প্রদান করেছে (সীমাবদ্ধতার সঙ্গে) এবং

→ যদি কোনো সংশোধনীতে সংবিধানের মূল কাঠামোকে অগ্রাহ্য করা হয় তাহলে কাঠামোটি অপরিবর্তিত রাখার জন্য বিচার বিভাগকে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার চুড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে।

সংবিধান একটি গতিশীল ও জীবন্ত দলিল ঃ

অনেকটা জীবন্ত প্রাণীর মতোই এই সংবিধান সময়ে সময়ে উদ্ভূত ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির প্রতি সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। জীবন্ত প্রাণীর মতো সংবিধান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এমনকি এতগুলো সংশোধনের পরে ও আমাদের সংবিধান সমাজে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলছে। এই গতিশীল বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা এর রয়েছে। এটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংবিধানের একটি সিলমোহর।

বিচার বিভাগের অবদান ঃ

বিচার বিভাগ পার্লামেন্টকে তার সমস্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংবিধানের রূপরেখার মধ্যে থেকে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং কোনো অপ্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণকে রোধ করে, কারণ একবার কোনো আইন সাংবিধানিক রূপরেখার বাইরে প্রণীত হলে তা ভালো অর্থে হলেও ক্ষমতাশালীরা তার অপব্যবহার করতে পারে। গণতন্ত্র হচ্ছে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করার একটি পন্থা। কারণ এটি জনগণের মঙ্গাল সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত কেশবানন্দ ভারতী মামলায় বিচার বিভাগ সংবিধানের আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান জটিলতা সমূহের একটা সমাধান সূত্র খুঁজে বের করেছিল।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের পারদর্শিতা ঃ

আমাদের দেশের সংবিধান যখন তৈরি হয়েছিল তখন এদেশের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের একটি সাধারণ দর্শন ছিল।স্বাধীনতার পর নেহেরুর বিখ্যাত ভাষণে তিনি সেই দর্শনের কথাই বর্ণনা করেছেন এবং একে লক্ষ হিসাবে তুলে ধরেছেন। গণপরিষদের সকল নেতৃবৃন্দ ও এই দর্শনের উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, সকল মানুষের কল্যাণ সাধন এবং একতা, এগুলো জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ এই দর্শনের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং একে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তাই আমাদের সংবিধান এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং অর্ধশতক পেরিয়ে এসে আজও এটি সমান মর্যাদা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজনীতি এবং মত পার্থক্য এবং বিতর্ক প্রয়োজনীয় বিষয়। এটি হচ্ছে বৈচিত্র্য, সচলতা এবং মুক্তমনের প্রতীক। তত্ত্বগতভাবে হয়ত চূড়ান্ত অবস্থান সঠিক আবার মতাদর্শগতভাবে আকর্ষণীয়, কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে প্রতিটি মানুষকে তার চূড়ান্ত অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিমার্জন করে একটি সাধারণ মতামতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে, একমাত্র তখনই গণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্ভব।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 1 X 1 = 1

১) ভারতীয় সংবিধান কবে কার্যকর হয়?

উঃ- ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।

২) ভারতের সংবিধান কবে প্রথম সংশোধন হয়?

উঃ- ১৯৫১ সালে প্রথম ভারতীয় সংবিধান সংশোধত হয়।

৩) ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়টি সংবিধান ছিল?

৪) রাশিয়া ফেডারেশন কবে প্রথম নতুন সংবিধান তৈরি করে?

৫) ফ্রান্সের প্রথম ও পঞ্চম সংবিধান কবে রচিত হয়?

৬) সংবিধানের কত নং ধারা অনুসারে ভারতীয় সংবিধানকে সংশোধন করা যায়?

৭) সংবিধানের কত নং ধারা অনুসারে সংসদ কোন রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করতে পারে?

৮) এখন পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধান কত বার সংশোধিত হয়েছে?

৯) কততম সংবিধান সংশোধনীতে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

১০) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি কবে যুক্ত হয়?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 2 **X** 1 = 2

১) সংবিধান বলতে কী বোঝ?

২) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলতে কী বোঝ?

৩) বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলতে কী বোঝ?

৪) ভারতীয় সংবিধানকে কেন এত বেশি বার সংশোধন করা হয়েছে?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 4 **X** 1 = 4

১) ভারতীয় সংবিধানকে একটি জীবন্ত দলিল বলা হয় কেন ?

২) ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি আলোচনা করো।

৩) সুপরিবর্তনীয় এবং দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কী বোঝ?

দশম অধ্যায়

সংবিধানের দর্শন

সংবিধানের দর্শন বলতে কী বোঝায় ঃ

ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই গণপরিষদে এই সংবিধানকে তত্ত্বগতদিক থেকে পরিমার্জিত ও উচ্চস্তরীয় মূল্যবোধে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে যুক্তিসংঙ্গাত বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে সেইগুলো সম্পর্কে জানতে পারব। সংবিধানের একটি রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র নৈতিক বিষয়েরই মূল্যায়ন করে না, বরং তা এর অন্তর্গত অনেক মূল্যবোধের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলোকেও উন্মোচিত করে।

আমাদের সংবিধানের রাজনৈতিক দর্শন ঃ

দর্শনকে এক কথায় বর্ণনা করা কঠিন এবং কোনো একটি স্তরে আবদ্ধ নয়। কারণ এটি উদার গণতান্ত্রিক, সমানাধিকারবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সম্প্রদায়গত মূল্যবোধের প্রতি উন্মুক্ত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু ও ধারাবাহিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতি সংবেদনশীল এবং একটি সমষ্টিগত সাধারণ জাতীয় পরিচিতি নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংক্ষেপে বলা যায়, এটি স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জাতীয় ঐক্যের কিছু বিষয়ের প্রতি সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সত্য হল এই যে, এরূপ দর্শন গ্রহণের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ এবং গণতন্ত্রিক পদ্ধতির উপর স্পষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ

সংবিধানের প্রথম সংকল্প হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। ভারতীয় সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একইভাবে বিনা বিচারে আটকের বিরুদ্ধে ও আমাদের স্বাধীনতা প্রধান করা হয়েছে।

সামাজিক ন্যায় ঃ

সংবিধান রচয়িতাগণ বিশ্বাস করেন যে, দীর্ঘকালের বঞ্চনার হাত থেকে উত্তরণের জন্য শুধুমাত্র সাম্যের অধিকার অথবা ভোটদানের অধিকারই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে বিশেষ সংবিধানিক সুযোগ সুবিধা প্রদান আবশ্যক। যার ফলে সংবিধান প্রণেতাগণ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য আইনসভায় বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন।

বৈচিত্র্যতা এবং সংখ্যালঘু অধিকারের প্রতি সম্মান ঃ

ভারতবর্ষ হচ্ছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের দেশ। ফ্রান্স ও জার্মানির বিপরীতে আমাদের দেশ বহুভাষা ও ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। কোনো একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করবে না। এই বিষয়টি আমাদের সংবিধানকে সম্প্রদায়ভিত্তিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মমত পালন ও প্রচার করতে পারবে। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পোষণ বা বিরোধীতা করতে পারবে না।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধিকার ঃ

ভারতের সংবিধান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করে তাদের ধর্মশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার দিয়েছে। ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় উভয়েরই ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধীতা ঃ

ভারতে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ মানে পারস্পরিক বর্জন নয়, বরং দূরত্ব বজায় রাখার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণা রাষ্ট্রকে সমস্ত ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। এই দুটি নীতির মধ্যে রাষ্ট্র সেটিকেই প্রাধান্য দেয় যা সাম্য, উদারনৈতিকতাবাদ এবং সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সার্বজনীন ভোটাধিকার ঃ

ভারতের জাতীয়তাবাদ সবসময় প্রতিটি ব্যক্তির ইচ্ছা এবং রাজনৈতিক আদেশকে মান্যতা দেয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ধারণা জাতীয়তাবাদের গভীরে মিশে আছে। মতিলাল নেহেরু কমিটির রিপোর্ট ১৯২৮ সালে এই বিষয়টিকে আরও বেশি স্পষ্ট করে যে,২১ বছর বয়সি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের পার্লামেন্ট অথবা জনপ্রতিনিধি সভায় ভোটদানের অধিকার রয়েছে। সংবিধানের ৬১ তম সংবিধান সংশোধনে (১৯৪৯ সালে) ভোটাধিকারের বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ

যুক্তরাষ্ট্র হল এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যেখানে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক। এর একটি হল প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ও অপরটি হল জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি স্তরের সরকার হবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষমতা সম্পন্ন, এই দুই ধরনের সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট থাকবে। এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য থাকবে স্বাধীন বিচার বিভাগ।

জাতীয় পরিচিতি ঃ

এভাবে সংবিধানে ক্রমাগত একটি সর্বজনীন পরিচিতির বিষয়টি বলবৎ করার চেষ্টা করছে। সর্বজনীন জাতীয় পরিচিতির বিষয়টি স্বচ্ছ ধর্মীয় বা ভাষাগত পরিচিতি ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভারতের সংবিধান এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেষ্টা করেছে। বলপূর্বক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসের পরিবর্তে আমাদের সংবিধান সত্যিকারের সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা ছিল ডঃ আম্বেদকরের আন্তরিক স্বপ্ন ও লক্ষ্য।

পদ্ধতিগত সাফল্য ঃ

ভারতীয় সংবিধানের কিছু পদ্ধতিগত সাফল্য রয়েছে। এগুলো হল -

ক) ভারতীয় সংবিধান রাজনৈতিক বিবেচনার প্রতি বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে সংবিধানের রূপকারগণ সকলের মতামতকেই যথাসম্ভব গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

খ) এটি সমঝোতা এবং গ্রহণযোগ্যতার শক্তির প্রতিফলন ঘটায়।

সমালোচনা ঃ

ভারতীয় সংবিধান বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচিত হয়েছে। এগুলো হল -

ক) একটি দেশের সংবিধান অবশ্যই একটি মাত্র সুদৃঢ় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এ বিষয়টি সব দেশের ক্ষেত্রে সত্য নয়, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ যার একটি সংগঠিত সংবিধান রয়েছে।

খ) সংবিধান সম্পর্কে দ্বিতীয় সমালোচনাটি হল এই যে, এটি অপ্রতিনিধিত্বমূলক। তখনকার সময়ে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল না এবং এর অধিকাংশ সদস্যরা এসেছিল সমাজের অগ্রসর শ্রেণির মধ্যে থেকে।

গ) শেষ সমালোচনাটি হল যে, ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে ধার করা একটি দলিল। যা পাশ্চাত্য সংবিধান থেকে অনেক ধারা অনুকরণ করে ভারতীয় জনগণের সংস্কৃতির উপর অস্বাভাবিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা ঃ

এই সংবিধানের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো হল -

১। ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে জাতীয় ঐক্য সম্পর্ক একটি কেন্দ্রীভূত ধারণা।

২। এতে বিশেষ করে পরিবারের অভ্যন্তরে লিঙ্গ সম্পর্কিত ন্যায় বিচার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় নি।

৩। এটি স্পষ্ট নয় যে কোনো একটি দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে নির্দিষ্ট কিছু আর্থ সামাজিক অধিকারের কথা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসাবে না রেখে নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোই একে একটি জীবন্ত দলিলের রূপ দিয়েছে। এর আইনগত ব্যবস্থাসমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস মূলত সমাজকর্তৃক গৃহীত একটি বিশেষ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান এই দর্শনের ব্যাখ্যা করে।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- $1 \mathbf{X} 1 = 1$

১) জাপানের সংবিধান কী নামে জানা হয়?

(ক) অদ্বিতীয়, (খ) শান্তিপূর্ণ, (গ) নমনীয়, (ঘ) অনমনীয়া।

উঃ- (খ) শান্তিপূর্ণ।

২) জাপানের সংবিধানের কত নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তির কথা বলা হয়েছে?

(ক) ২০৫ নং, (খ) ২০ নং, (গ) ৯ নং, (ঘ) ৭ নং।

উঃ- (গ) ৯ নং।

৩) ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংকল্প হল -

(ক) ব্যক্তি স্বাধীনতা, (খ) সমাজতন্ত্র, (গ) ধর্মনিরপেক্ষতা, (ঘ) সৌভাতৃত্ব।

৪) ভারতের কোন রাজ্য সংবিধানের ৩৭০ ধারায় বিশেষ সুবিধা ভোগ করত?

(ক) নাগাল্যান্ড, (খ) সিকিম, (গ) জম্মু-কাশ্মীর, (ঘ) আসাম।

৫) ভারতের কোন রাজ্য ৩৭১ (A) ধারা অনুসারে বিশেষ রাজ্যের সুবিধা ভোগ করে?

(ক) নাগাল্যান্ড, (খ) সিকিম, (গ) আসাম, (ঘ) ত্রিপুরা।

নীচের প্রশ্নগুলোর এক কথায় উত্তর দাও ঃ- 2 **X** 1 = 2

১) ভারতীয় সংবিধান কাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

২) ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝ?

৩) কোন দেশের সংবিধানকে শান্তির সংবিধান বলা হয়?

৪) ভারতের কোন রাজ্য থেকে সম্প্রতি ৩৭০ নং ধারা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে?

৫) লিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝ?

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ- 2 **X** 1 = 2

১) ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ?

২) ভারতীয় সংবিধান সামাজিক ন্যায় কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

৩) ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য কী বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৫) সার্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝ?

৬) ভারতীয় সংবিধানের দুটো পদ্ধতিগত সাফল্য লেখো।

৭) ভারতীয় সংবিধানের দুটো ত্রুটি লেখো।

c_g Aa¨vq

ivR‰bwZK ZË

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে -

* রাজনীতি বলতে কী বুঝায়?
* রাজনৈতিক তত্ত্ব কী?
* রাজনৈতিক বিষয়টিতে আমরা কী পাঠ করি?
* রাজনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ -
* কেন আমরা রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠ করব?

ivRbwZ ej‡Z Kx বোঝায়? (What is Politics ?)

'রাজনীতি' শব্দটি একটি বহু চর্চিত বিষয়। রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। 'রাজনীতি' শব্দটি গ্রীক শব্দ "Polis" থেকে এসেছে। অর্থাৎ ইংরেজী 'Politics' কথাটি গ্রীক শব্দ "Polis" থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'Polis' শব্দের অর্থ হল নগর। বর্তমান আধুনিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে এবং রাষ্ট্র কাঠামোরও পরিবর্তন হয়েছে। তাই রাজনীতি বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় - তা হলো, দলীয় মতাদর্শ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান বলের মতে - রাজনীতি হল এক ধরনের কার্যকলাপ যা সমাজের সকল স্তরের বিরোধ ও তার মীমাংসার সঙ্গে যুক্ত। মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাজনীতি হলো - একটি শ্রেণিগত ধারণা, যা ক্ষমতাকে কার্যকর করার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে।

ivR‰bwZK ZË Kx ? (What is Political Theory ?)

রাজনৈতিক তত্ত্ব হল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা, যা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দেশের সংবিধান, সরকার এবং মানুষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন নীতি ও আদর্শগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে। সমাজের গঠনগত কাঠামো থেকে শুরু করে সরকার এবং তার প্রয়োজন ইত্যাদি সব বিষয়েই মানুষের জানার আগ্রহ অসীম। তাই রাজনৈতিক তত্ত্বের কাজ হলো সমাজের যাবতীয় প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

রাজনৈতিক বিষয়টিতে আমরা কী পাঠ করি? (What do we study in Political Theory ?)

সংবিধান, সরকার, সামাজিক জীবনের ধ্যান ধারণা তৈরি হয়ে থাকে রাজনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা। রাজনৈতিক তত্ত্বই নির্ধারণ করে কোন রাষ্ট্রের সংবিধান, প্রশাসন, অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি। স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতির ধারণা তৈরি হয় রাজনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিককে উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করার জন্য প্রথমে রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। তাই কোন দেশের অনুশাসন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, পুরনো নীতি ও আদর্শগুলোকে সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা করে থাকে।

রাজনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ (Putting Politics Theory to Practice)

রাজনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের চেয়ে তাত্ত্বিক প্রয়োগই বেশি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের কাজ হলো নজর দেওয়া। আমরা দেখতে পাই, রাজনৈতিক তত্ত্ব রাষ্ট্রের এবং সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলে কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। দেখা গেছে রাজনৈতিক তত্ত্বে গণতন্ত্র, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা মতামত ও সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাস্তবে কখনো কখনো দেখা যায়, কিছু মানুষের কাছে গণতন্ত্র একেবারেই নেই। সে তার ভোটাধিকার পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারে না। তাই বলা যায়, বাস্তবে রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ সবসময় দেখা যায় না।

‡Kb Avgiv ivR‰bwZK ZË cvV Kie? (Why should we study Political Theory?)

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নে কেন আমরা রাজনৈতিক তত্ত্ব বিষয়টি পাঠ করবো? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজস্ব কিছু রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা নিয়ে সমাজে বসবাস করে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যে সবসময় থাকে না। তাই বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে রাজনৈতিক তত্ত্ব পড়া বা, জানা প্রয়োজন। রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের কাছে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে। রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠার জন্যও এর পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠ করলে নাগরিকগণ দেশের রাষ্ট্র-কাঠামো, শাসন প্রণালী, গণতন্ত্র, একনায়ক তন্ত্র, রাজনীতি, দেশের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারে।

ckgvb - 1 (GKwU পূর্ণ ev‡K¨ DËi w`‡Z n‡e)

১) "হিন্দ স্বরাজ" - গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তর ঃ মহাত্মা গান্ধী।

২) সক্রেটিস কোন দেশের দার্শনিক ছিলেন?

৩) কারা সক্রেটিসকে মৃত্যুদন্ড দেন?

৪) প্লেটো কে?

৫) প্লেটোর গুরু কে?

৬) সক্রেটিসের শিষ্য কে ছিলেন?

৭) "The Republic" (দ্যা রিপাবলিক) গ্রন্থটি কার লেখা ?

৮) সক্রেটিস কে ছিলেন?

৯) "পলিটিকস্"- শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

১০) "রাষ্ট্র দর্শনের জনক" - কাকে বলা হয়?

১১) রাজনীতি কী?

১২) "A Grammar of Politics" গ্রন্থটির লেখক কে?

১৩) রাজনীতিকে কে “Master Science” বলে অভিহিত করেন?

১৪) মার্কসীয় রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু কোনটি?

১৫) রাজনীতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ckgvb - 2 (40wU k‡ãi g‡a¨ DËi w`‡Z n‡e)

১) রাজনীতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর ঃ রাজনীতি বলতে সাধারণভাবে যা বুঝায় - তা হলো, দলীয় মতাদর্শ ও ক্ষমতা দখলে লড়াই এবং নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান বলের মতে, রাজনীতি হলো, এক ধরনের কার্যকলাপ যা সমাজের সকল স্তরের বিরোধ ও তার মীমাংসার সঙ্গে যুক্ত।

২) রাজনৈতিক তত্ত্ব বলতে কী বোঝ?

৩) রাজনৈতিক তত্ত্বের ২টি কাজ লেখো।

৪) রাজনীতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫) “Republic” গ্রন্থের দুইজন চরিত্রের নাম করো।

ckgvb - 4 (80 wU k‡ãi g‡a¨ DËi w`‡Z n‡e)

১) রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলো কী কী - আলোচনা করো।

অথবা

রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্যগুলো কী?

অথবা

রাজনৈতিক তত্ত্বের কার্যাবলি লিখো।

ckgvb - 5/6 (150wU k‡ãi g‡a¨ DËi w`‡Z n‡e)

১) কেন আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বপাঠ করব?

অথবা

রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগীতাগুলো কী?

wØZxq Aa¨vq

¯vaxbZv

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে -

* স্বাধীনতা কী? * স্বাধীনতার আদর্শ, * প্রতিবন্ধকতার উৎস, * কেন আমাদের প্রতিবন্ধকতা প্রয়োজন? * উদারনীতিবাদ, * ক্ষতিকারক নীতি, * নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতা, * মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

¯vaxbZv t (Freedom)

স্বাধীনতা কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল "Liberty"। 'Liberty' কথাটি লাতিন শব্দ 'Liber' এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Freedom' থেকে এসেছে। সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির উপর বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিকেই বোঝানো হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা বলতে এমন একটি বিশেষ পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণকে বোঝায়, সেখানে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়। মার্কস্‌বাদীদের মতে, স্বাধীনতা হল মানুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ। যদি কোনো ব্যক্তির উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বা বল প্রয়োগ না করা হয় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তা হলে ওই ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গন্য করা হয়।

¯vaxbZvi Av`k t (The Ideal of Freedom)

সমাজে বসবাসকারী মানুষদের কাছে স্বাধীনতা একটি আদর্শ স্বরূপ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করা যায়। স্বাধীনতার আদর্শ কেবল বিদেশি শক্তির কবল থেকে মুক্ত হওয়াই নয়, নিজের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করা হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার আদর্শ প্রসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলা, আন-সান--সুকি, গান্ধিজী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে ২৮ বছর কারাবাসে ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী মূলক বই "Long walk to Freedom" -এ স্বাধীনতার লড়াই সম্পর্কে জানা যায়।

cwZeÜKZvi Drm t (The Source of Constrains)

ব্যক্তির স্বাধীনতা অবাধ নয়। স্বাধীনতা যদি অবাধ হয়, তাহলে একজনের দ্বারা অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অধিকারের উপর, স্বাধীনতার উপর কিছু বিধিনিষেধ বা, প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। এই প্রতিবন্ধকতার উৎস বলপ্রয়োগ হতে পারে, অথবা সরকারি আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্বাধীনতার উপর প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করা হয়েছিল বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শাসনকালে বিভিন্ন দেশের ওপর। জাতপাত ভিত্তিক সামাজিক ও চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বাধীনতার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

‡Kb Avgv‡`i cwZeÜKZv c‡qvRb t (Why do we need Constraints?)

স্বাধীনতা হল একটি পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে, প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারবে। সাধারণভাবে

বলা যায়, স্বাধীনতা হল সকল কিছু বিধিনিষেধের অনুপস্থিতি অর্থাৎ অবাধ স্বাধীনতা। আসলে নিয়ন্ত্রনহীন বা, অবাধ স্বাধীনতা হল স্বেচ্চাচারিতার নামান্তর। অবাধ স্বাধীনতা থাকলে সকল মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না। সবল ও অর্থবান লোকেরাই সকল স্বাধীনতা ভোগ করবে। দুর্বল বা দরিদ্ররা কোন স্বাধীনতাই ভোগ করতে পারবে না। তাই সকলে যাতে সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার জন্য স্বাধীনতার উপর প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

D`vibxwZev` t (Liberalism)

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে অর্থাৎ ১৬৪০-এর দশকে সংঘটিত ইংল্যান্ডের পিউরিটান বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে উদারনীতির আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটে। লক, বেন্থাম, জে.এস. মিল প্রমুখরা উদারনীতিবাদের প্রবক্তা। উদারনীতিবাদ শব্দটি লাতিন শব্দ 'Liber' থেকে এসেছে। 'Liber' -কথার অর্থ হল স্বাধীনতা। উদারনীতিবাদের অর্থ হল ব্যক্তি স্বাধীনতার মতবাদ। যে মতবাদ ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, স্বাধীনতার অধিকার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় বলে মনে করে, তাকে বলা হয় উদারনীতিবাদ। উদারনীতিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাজনৈতিক সাম্য, নিরপেক্ষ আদালত, বহুদলীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেয়।

ক্ষতিকারক নীতি কী? (What is Harm Principle?)

জনস্টুয়ার্ট মিল স্বাধীনতা সম্পর্কিত রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনায় তাঁর "On Liberty" গ্রন্থে ক্ষতিকর নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জনস্টুয়ার্ট মিল দুই ধরনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, অবাধ স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। মিল ব্যক্তির কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন - যথা আত্মকেন্দ্রিক এবং পরকেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা অবাধ। নিজের এলাকায় ব্যক্তি পুরোপুরি স্বাধীন, কিন্তু পরকেন্দ্রিক কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অপরের স্বার্থ যুক্ত থাকে। তাই এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের কিছু যৌক্তিকতা আছে বলে *মিল* মনে করেন। কোন ব্যক্তির কাজকর্ম যদি অন্যের ক্ষতি সাধনের কারণ হয়, তা হলে রাষ্ট্র ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যাকে *মিল* ক্ষতিকারক নীতি বলে অভিহিত করেছেন।

‡bwZevPK I BwZevPK ¯vaxbZv t (Negative and Positive Liberty)

স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণার দুটি দিক রয়েছে। একটি হল নেতিবাচক এবং অপরটি হল ইতিবাচক স্বাধীনতা। নেতিবাচক (Negative) স্বাধীনতা বলতে বুঝায় ব্যক্তির ওপর সকল ধরণের বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। অর্থাৎ সর্বপ্রকার বাধা নিষেধের অনুপস্থিতিকে নেতিবাচক স্বাধীনতা বলে। বেন্থাম, হবস, লক্, জেমসমিল, জনস্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ স্বাধীনতাকে নেতিবাচক অর্থে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন।

- ইতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা বলতে স্বশাসন ও স্বনিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারে, যেখানে অবাধ স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকবে না। ইতিবাচক স্বাধীনতা হল অন্যের ক্ষতি না করে নিজে স্বাধীনতা ভোগ করা। রুশো, হেগেল, গ্রিন প্রমুখরা ইতিবাচক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

gZcKv‡ki ¯vaxbZv t (Freedom of Expression)

স্বাধীনভাবে ব্যক্তির মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা থাকে, তাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে সাধারণভাবে বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতাকে বোঝায়।

তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকার বিশেষ কোনো কারণে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

ckgvb - 1(GKwU পূর্ণবাক্যে DËi w`‡Z n‡e)

১) 'Long Walk of Freedom' বইটি কার লেখা?

২) কে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন?

৩) নেলসন মেন্ডেলা কে?

৪) নেলসন মেন্ডেলাকে কত বছর জেলে থাকতে হয়?

৫) আং সাং সুকি কে?

৬) আং সাং সুকি কার সত্যাগ্রহ এবং অহিংস মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন?

৭) "Freedom From Fear"- গ্রন্থটি কার লেখা?

৮) "আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হল ভয় থেকে মুক্তি, আর যদি না তোমরা ভয় থেকে মুক্ত হতে পারো, তাহলে মর্যাদা পূর্ণ মানব জীবনযাপন করতে পারবে না - উক্তিটি কার?

৯) 'স্বরাজ' শব্দের অর্থ কী?

১০) আক্ষরিক অর্থে স্বরাজ কয়টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত?

১১) "হিন্দ স্বরাজ" - গ্রন্থটি কার লেখা?

১২) কবে গান্ধিজী "হিন্দ স্বরাজ" গ্রন্থটি রচনা করেন?

১৩) স্বাধীনতা কী?

১৪) প্রতিবন্ধকতার একটি উৎস লেখো।

১৫) কবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু লাহোরে ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ দেন?

১৬) "ক্ষতিকারক" নীতির প্রবক্তা কে.?

১৭) দুইজন নেতিবাচক স্বাধীনতার সমর্থকের / রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম লেখো।

১৮) দুইজন ইতিবাচক স্বাধীনতার সমর্থকের নাম লেখো।

১৯) 'On Liberty' গ্রন্থটি কার লেখা?

২০) "Ramayana Retold' বইটি কার লেখা?

২১) 'The Satanic' বইটি কার লেখা?

২২) 'The last Temption of Christ' বইটি কার লেখা?

২৩) 'Me Nathuram Boltey' বইটি কার লেখা?

২৪) আন-সান-সুকিকে কোথায় গৃহবন্দী করা হয়েছিল?

২৫) "স্বাধীনতার অর্থ স্বরাজ" কথাটি কে বলেছেন?

২৬) "অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অনান্য স্বাধীনতা অর্থহীন" - কথাটি কে বলেছেন?

ckgvb - 2 (40wU k‡ãi g‡a¨ DËi w`‡Z n‡e)

১) স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির উপর বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিকেই বোঝানো হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা বলতে এমন একটি বিশেষ পরিবেশের সযন্তে সংরক্ষণকে বোঝায় যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিসত্ত্বাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ পায়। মার্কসবাদীদের মতে, স্বাধীনতা হল মানুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতার সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

২) ইতিবাচক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

৩) নেতিবাচক স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়?

৪) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কাকে বলে?

৫) প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝ?

ckgvb - 4 (80wU k‡ãi g‡a¨ DËi w`‡Z n‡e)

১) ক্ষতিকারক নীতিটি কী?

২) নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

অথবা

নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য কী?

৩) গান্ধিজীর স্বরাজের ধারণাটি আলোচনা কর।

ckgvb - 5/6

১) কেন আমাদের প্রতিবন্ধকতা প্রয়োজন?

২) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝ? ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য কোনো ধরণের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

৩) জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

৪) মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কী ধরণের যুক্তি সংগত বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় বলে তুমি মনে করো? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

৫) স্বাধীনতার ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

ZZxq Aa¨vq

mvg¨

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে -

* সাম্য কী? (What is equality?)
* সাম্যের ধারণা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? (Why does Equality matter?)
* সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য (Equality of opportunities)
* প্রকৃতি ও সামাজিক বৈষম্য সাম্যের তিনটি দিক - রাজনৈতিক সাম্য, সামাজিক সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য।
* নারীবাদ।
* কীভাবে আমরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি?

mvg¨ Kx? **(What is Equality?)**

সাম্য একটি বহুমাত্রিক ধারণা (Multiple dimensional concept) আপাতদৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায়, সকলেই সমান। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলতে সমতা বোঝায় না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, - সাম্য বলতে বোঝায়, বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি এবং সকলকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। অন্যভাবে বলা যায়, সকলের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধাই সাম্য।

সাম্যের ধারণা এত গুরুত্বপূর্ন কেন? **(Why does equality matter?)**

সমাজে সাম্য হল একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ। মানব সমাজের ইতিহাসে সকল ধর্মই বিশ্বাস করে যে, সমস্ত মানুষই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সাম্যের ধারণা এটা উপলব্ধি করে যে, এই পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বংশ ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই সমাজে সমানভাবে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আসলে সাম্যের আদর্শে হল রাষ্ট্রশক্তি এবং অনান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যারা সাম্য বিরোধী এবং যারা সমাজে বংশ, মর্যাদা, সম্পদ, ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য বজায় রাখার পক্ষপাতী, তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক আপোষহীন সংগ্রাম। এই সাম্যের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে বহুদেশ আন্দোলন গড়ে তুলে। সাম্যের ধারণা ছাড়া সকল মানুষ, মানুষ হিসাবে গণ্য হবেনা। তাই মানব সমাজে সাম্যের ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য **(Equality of opportunities)**

সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সকলের সাম্যকে ইতিবাচক সাম্য বলা হয়। তবে, সব মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও দাবি সমান নয় - তাই সকলকে এই ধরণের সমান সুযোগ একইরকম ভাবে দেওয়া নাও যেতে পারে। সকল মানুষকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মধ্যদিয়েই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। তবে, সুযোগ সুবিধার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করলে নাগরিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের বিকাশ ঘটানো থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সকলকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শটি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

cvKwZK I mvgwRK ^elg¨ t (Natural and social Inequalities)

সমাজে সকলের জন্য সাম্যের কথা বলা হলেও বাস্তবে সকলের প্রতি সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে বৈষম্য সর্বদা থেকেই যায়। যে ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বৈষম্য বলতে সেই ধরনের বৈষম্যগুলোকে বোঝায়, যা ব্যক্তির নিজস্ব কাজ করার ক্ষমতা বা, বুদ্ধির জন্য সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে কোনোদিন সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।

- স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বৈষম্যের মত কিছু সামাজিক বৈষম্যও সমাজে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক বৈষম্য হল যে গুলো সমাজ দ্বারা সৃষ্টি হয়। যেমন বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন গোষ্ঠির আলাদা আলাদা রীতিনীতি রয়েছে। তা বলা যায়, সকল মানুষ সকল দিক দিয়ে সমান হতে পারে না।

mv‡g¨i i/c t (Form of Equality)

সাম্যের প্রধানত ঃ চারটি রূপ রয়েছে - (ক) স্বাভাবিক সাম্য, (খ) সামাজিক সাম্য, (গ) আইনগত সাম্য এবং, (ঘ) আন্তর্জাতিক সাম্য। আইনগত সাম্যের আবার তিনটি রূপ রয়েছে। ব্যক্তিগত সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, এবং অর্থনৈতিক সাম্য।

mv‡g¨i wZbwU w`ক t (Three Dimensions of Equality)

বিভিন্ন ধরনের চলমান সামজিক বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিদ ও চিন্তাবিদরা সাম্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করা করেছে। সেগুলো হল - (ক) সামাজিক সাম্য, (খ) রাজনৈতিক সাম্য ও (গ) অর্থনৈতিক সাম্য।

ivR‰bwZK mvg¨ t (Political Equality)

রাজনৈতিক সাম্য বলতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সমান অংশ গ্রহণের অধিকারকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকারের নিকট অভাব-অভিযোগ পেশ, সরকারি কার্যের সমালোচনা করার সমান অধিকারকে রাজনৈতিক সাম্য বলা হয়।

mvgwRK mvg¨ t (Social Equality)

সামাজিক সাম্য বলতে সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতাকে বোঝায়। যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ মর্যাদা, অর্থ প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নিরুপণ করা হয় না, তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলা হয়।

A_‰bwZK mvg¨ t (Economic Equality)

সাধারণত আয় ও সম্পত্তির অধিকারের সমতাকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। অধ্যাপক ল্যাস্কি ও অর্থনৈতিক সাম্য বলতে বুঝিয়েছেন সকলের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানকে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একই কাজের জন্য সমবেতন প্রদান, সমান সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

Kxfv‡e Avgiv mvg¨ cwZôv Ki‡Z cwi? (How can we promote Equality)

সমাজের সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদী ও সমাজবাদীরা কয়েকটি উপায়ের কথা বলেছেন। সেগুলো হল -

(ক) আনুষ্ঠানিক সাম্য ঃ (Establishing formal Equality)

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকারের বিধিনিষেধ ও প্রথাগত সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটানো। সমাজে প্রচলিত অস্পৃশ্যতা, উচুজাত-নিচু জাত, নারী-পুরুষে ভেদাভেদ প্রভৃতি সমাজের বুক থেকে চিরতরে বিলোপ ঘটিয়ে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, একে আনুষ্ঠানিক সাম্য বলা হয়।

(খ) স্বতন্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ (Equality through differential treatment)

কখনো কখনো মানুষের সাথে স্বতন্ত্র আচরণ করার মধ্য দিয়েও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এর জন্য মানুষের মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক পার্থক্যগুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দিব্যাঙ্গধারী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে সিঁড়ি বা, র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কল সেন্টারে কর্মরত মহিলারা যাতে কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায়, তার ব্যবস্থা করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

(গ) সদর্থক কার্যকলাপ ঃ (Affirmative action)

সদর্থক কার্যকলাপ যে ধারণার উপর গড়ে উঠেছে সেটি হল, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই পর্যাপ্ত নয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসা অসাম্য এবং বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যকে দূর করার জন্য কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন - পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় গুলোর উন্নতির জন্য অর্থবরাদ্দ করা, বৃত্তি প্রদান, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা, চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমেও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

bvixev` t (Feminism)

বর্তমান দিনে "নারীবাদ" একটি বহু চর্চিত বিষয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী মতবাদ হিসেবে নারীবাদের বিকাশ ঘটে। সমাজে নারী ও পুরুষদের অধিকার নিয়ে আলোচনাই হল নারীবাদ। সমাজে নারী ও পুরষদের সমান অধিকারের কথা বলে, তাদের নারীবাদ বলা হয়। নারীবাদীদের মতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষদের গুরুত্ব অধিক। নারীদের শারিরীক ক্ষমতা কম হওয়ায় তাদের দুর্বল বলে মনে করা হয়। নারীবাদীরা মনে করে থাকেন বৈষম্যের জন্য দায়ী হল সমাজ, এই ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে দায়ী করা যায় না। বর্তমান দিনে মহিলারা ও পুরুষদের মতো বাড়ীর বাইরে কাজকর্ম, দোকানদারী, চাকুরি করে থাকে এবং বাড়ীর কাজও করে থাকে।

ckgvb - 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১) ফরাসী বিপ্লবের মূল স্লোগান কী ছিল?

উত্তর ঃ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা।

২) কবে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়?

৩) সাম্য কী?

৪) সাম্যের ধারণার উৎপত্তি কোন্ দেশে হয়েছিল?

৫) সাম্যের ধারণাটি কয় মাত্রিক?

৬) নেতিবাচক সাম্য কী?

৭) ইতিবাচক সাম্য কী?

৮) 'Utopia' গ্রন্থটি কার লেখা?

৯) "Spirit of the laws" গ্রন্থটি কার লেখা?

১০) "Rule of Law" -বইটি কার লেখা ?

১১) "City of God" - বইটি কে লেখেন?

১২) সাম্যের প্রধান কয়টি রূপ রয়েছে?

১৩) আইনগত সাম্যের কয়টি রূপ রয়েছে?

১৪) "সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার অস্তিত্বই সম্ভব নয়" - কথাটি কে বলেছেন?

ckgvb - 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১) রাজনৈতিক সাম্য কাকে বলে?

উত্তর ঃ রাজনৈতিক সাম্য বলতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সমান অংশ গ্রহণের অধিকারকে বোঝায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশোধ সকলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, সরকারের নিকট অভাব অভিযোগ পেশ, সরকারি কার্যের সমালোচনা করার সমান অধিকারকে রাজনৈতিক সাম্য বলা হয়।

২) সামাজিক সাম্য বলতে কী বোঝ?

৩) অর্থনৈতিক সাম্য কাকে বলে?

৪) স্বাভাবিক সাম্য কী?

৫) নারীবাদ কী?

৬) সমাজবাদ কী?

৭) সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য বলতে কী বোঝায়?

ckgvb - 4

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ (৮০টি শব্দের মধ্যে)

১) সাম্যবাদের প্রধান তিনটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) সাম্য কী? সাম্যের ধারণা এত গুরুত্বপূর্ন কেন?

৩) নারীবাদ সম্পর্কে টীকা লেখো।

৪) সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য বলতে কী বোঝ? আনুষ্ঠানিক সাম্য বলতে কী বোঝায়?

৫) সাম্যের সাধারণ কারণটি আলোচনা করো?

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) কীভাবে সমাজে আমরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি?

২) সাম্যের বিভিন্ন রূপগুলো ব্যাখ্যা করো।

৩) সাম্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

PZ_ Aa¨vq

mvgwRK b¨vq

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে -

* ন্যায় বিচার কী? * সমকক্ষ লোকের প্রতি সমআচরণ, * সমানুপাতিক ন্যায়, * বিশেষ চাহিদার স্বীকৃতি, * ন্যায্য বণ্টন কী? * জনরল্‌সের ন্যায় তত্ত্ব। * মুক্ত বাজার বনাম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।

b¨vq wePvi Kx (What is Justice)

'ন্যায়' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'জাস্টিস' (Justice)। এই শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'জাস্টাস' (Justus) ও 'জাস্টিসিয়া (Justitia) থেকে। এর অর্থ হল সংযোগ সাধন। 'ন্যায়' বলতে নিরবিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার কে স্বীকার করে নেওয়া বোঝায়। জাস্টিনিয়ান ইনস্টিটিউটস (Institutes of Justinian)-এর মতে, 'ন্যায়' হল - সঠিক, সাধারণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি 'মানসিক অনুভূতি ও সদিচ্ছা"। ন্যায় বিচার বলতে বোঝায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার বা আচরণকে।

mvgwRK b¨vq t (Social Justice)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়ের প্রধান চারটি রূপের কথা উল্লেখ করেন। এইগুলো হল - (ক) আইনগত ন্যায়, (খ) রাজনৈতিক ন্যায়, (গ) সামাজিক ন্যায় এবং (ঘ) অর্থনৈতিক ন্যায়।

b¨v‡qi bxwZ t (Principal of Justice)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ন্যায়ের তিনটি নীতির কথা বলেছেন। এই নীতিগুলো হল - (ক) সমকক্ষ লোকের প্রতি সম আচরণ, (খ) সমানুপাতিক ন্যায় এবং (গ) বিশেষ চাহিদার স্বীকৃতি।

সমকক্ষ লোকের প্রতি সম আচরণ ঃ (Equal treatment for Equel)

সকল মানুষের প্রতি সমান ব্যবস্থা হল সমকক্ষ লোকের প্রতি সম আচরণের নীতি। এই নীতি অনুযায়ী বলা হয় - ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করার অধিকারী। সমান অধিকারের পাশাপাশি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সমমর্যাদার অধিকারকে রক্ষা করা। যদি দুটি ভিন্ন জাতির দুজন ব্যক্তি একই কাজ করে থাকেন, তাহলে তাদের দুজনকেই সমান মজুরি প্রদান করা উচিত। একজনকে ২০০ টাকা এবং অন্য জনকে ১০০ টাকা মজুরি প্রদান করা যাবে না।

mgvbcwZK b¨vq t (Proportionate Justice)

এই নীতিটি আসলে প্রথম নীতির দ্বিতীয় ধাপ বলা যেতে পারে। সমানুপাতিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, ন্যায়ের প্রথম নীতিটি যথেষ্ট নয়। এই নীতিতে বলা হয়েছে সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সমান আচরণের নীতি একমাত্র সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। সমাজের সকলের মধ্যে এমন কিছু অবস্থা বিরাজ মান রয়েছে, যেখানে

প্রত্যেক মানুষের প্রতি একই ধরণের আচরণ করা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। যেমন বলা যায়, যদি কোনো বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট ক্লাসের পরীক্ষায় সকলকে সমান নম্বর দেওয়া হয় - তাহলে ঠিক হবে না। ন্যায় তখনই হবে যখন প্রত্যেক ছাত্রকে তার পরীক্ষার উত্তর পত্রের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হয়। একেই বলা হয় সমানুপাতিক ন্যায়।

we‡kl Pwn`vi ¯xKwZ t (Recognition of Special Needs)

ন্যায় সম্পর্কিত তৃতীয় নীতিটি হল ব্যক্তির ন্যায্য পাওনা ও কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করার স্বীকৃতি। সমাজে এমন বহু নাগরিক আছেন, যারা জন্মগতভাবে সকলের মতো নয়। অর্থাৎ, শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধি নাগরিক ও আছে। এদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনের কথা রাষ্ট্রের স্মরণ রাখতে হবে। এদের জন্য শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই নীতিটি ভারতে রয়েছে। যেমন - S.C ও S.T-দের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

b¨vqe›Ub Kx? (Just Distribution)

যে কোনো সমাজে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারকে লক্ষ রাখতে হয়, যাতে দেশের প্রচলিত আইন এবং নিয়ম নীতিগুলো সমাজে সকল ব্যক্তির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হয়। এই জন্য সমাজের সকল ব্যক্তির মধ্যে বস্তু ও সেবার ন্যায্য বণ্টন করাও প্রয়োজন। যদি কোনো সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বর্তমান থাকে, তা হলে সমাজের যে প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে, তা এমন ভাবে পুর্নবণ্টন করা প্রয়োজন, যাতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নাগরিকরা সমান সযোগ-সুবিধার অংশীদার হতে পারে। ন্যায় বণ্টন করতে গিয়ে ভারতের সংবিধানে সমস্ত ধরণের অস্পৃশ্য আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নিম্নবর্ণের লোকদের মন্দিরে প্রবেশ, সরকারি চাকুরি, পানীয় জল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

Rb ij‡mi b¨vq ZË t (John Rawl's Theory of Justice)

জন রল্‌স ছিলেন একজন আমেরিকার রাষ্ট্র দার্শনিক। তিনি ১৯২১ খ্রিঃ ২১ শে ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন আমেরিকার ম্যারিল্যান্ডে। তিনি কান্ট, হবস, লক, জনস্টুয়ার্টমিল প্রমুখদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জন রলস রাষ্ট্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি ন্যায়ের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বে তিনি অজ্ঞতার (অজ্ঞতার) আচ্ছাদনের (Veil of Ignorance) কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সমাজে মানুষ তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এমন অজ্ঞতার মধ্যে থাকার ফলে ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের প্রয়োজন মতো অবস্থানকে পছন্দ করতে পারবে। যার সাহায্যে ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে, তখন অজ্ঞতার আড়াল থেকে তারা মুক্ত হবে। অজ্ঞতার আড়াল থেকে মুক্তি পেয়ে কোন ব্যক্তি যদি প্রতিবন্ধী হয়, তা হলে সে বিশেষ সুবিধা চাইতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাকে সুবিধা দিয়ে সমাজের মুলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

g³ evRvi ebvg ivóxq হস্তক্ষেপ t (Free Market Versus Intervention)

ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন স্বাধীনভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় প্রতিযোগিতার সুযোগ পায়, তখন সেই বাজার ব্যবস্থাকে মুক্ত বাজার বা, খোলা বাজার (Free Market) বলা হয়। এর ফলে একটি প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা তৈরি হয় বিক্রেতাদের মধ্যে। ফলে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগকে বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

- বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থকরা সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি সমর্থন করেন না। বাজার অর্থনীতির ওপর কিছুটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এই বিষয়ে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তা না হলে সাধারণ মানুষ এইগুলো ভোগ করতে পারবে না। তাই বলা যায়, মুক্ত বাজার নীতিতেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ckgvb - 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১) কনফুসিয়াস (Confucius) কোন্ দেশের দার্শনিক ছিলেন?

২) "The Republic" গ্রন্থটি কার লেখা?

৩) গ্রীসের রাজধানীর নাম কী?

৪) প্লেটো কোন্ দেশের দার্শনিক?

৫) প্লেটো কোন গ্রন্থে ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন?

৬) ইম্যানুয়েল কান্ট কোন্ দেশের দার্শনিক ছিলেন?

৭) 'ন্যায়' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ কী?

৮) 'ন্যায়' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?

৯) অ্যারিস্টটল কত প্রকার ন্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন?

১০) সামাজিক ন্যায় কী?

১১) রল্‌সের ন্যায় -এর কয়টি নীতি?

১২) রল্‌সের মতে, ন্যায় বিচার কী?

১৩) অজ্ঞতার আচ্ছাদন বা, 'Veil of Ignorance' কী?

১৪) বণ্টনমূলক ন্যায়ের ধারণাকে প্রচার করেন?

১৫) ন্যায়-ধারণার প্রথম শর্ত কী?

১৬) 'Political Justice' বইটির লেখক কে?

১৭) জন রল্‌স কে ছিলেন?

১৮) গ্লাকোন ও অ্যাডিমেন্টাস কারা?

১৯) "রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন" - কথাটি কার?

ckgvb - 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) সামাজিক ন্যায় কী?

২) ন্যায় বিচার কী?

৩) রাজনৈতিক ন্যায় কী?

৪) অর্থনৈতিক ন্যায় কী?

৫) সমানুপাতিক ন্যায় কী?

৬) মুক্ত বা খোলা বাজার কী?

৭) ন্যায্যবণ্টন কী? বা বণ্টন মূলক ন্যায় কী?

৮) 'অজ্ঞতার আচ্ছাদন' বলতে কী বোঝ?

ckgvb - 4

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ (৮০টি শব্দের মধ্যে)

১) প্লেটোর ন্যায় সংক্রান্ত ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

২) সমকক্ষ লোকের প্রতি সম-আচরণ বলতে কী বোঝায়? বিশেষ চাহিদার স্বীকৃতির মাধ্যমে কীভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

৩) মুক্তবাজার কী? মুক্তবাজার বা, খোলা বাজারের সুবিধাগুলো বা, উপযোগিতা কী?

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

১) ন্যায়ের প্রধান কয়টি নীতি রয়েছে? এই নীতিগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২) জন রল্‌সের ন্যায় তত্ত্বটি আলোচনা করো। বা, জন রল্‌সের "অজ্ঞতার আড়াল"-এর বিষয়ে আলোচনা করো।

৩) ন্যায়ের বিভিন্ন রূপগুলো আলোচনা করো।

৪) একটি দায়িত্বশীল সরকারের ওপর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য কী কী দায়িত্ব রয়েছে?

cÂg Aa¨vq

AwaKvi

GB Aa¨v‡q †_‡K hv Rvbv hv‡e -

* অধিকার কী? * বিভিন্ন ধরণের অধিকার, * অধিকারের উৎস, * প্রকৃতি, * মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে কান্টের ধারণা, * অধিকার ও দায়বদ্ধতা, * মানবাধিকার।

AwaKvi Kx? (What is Right)

সাধারণভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধাকে অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, -অধিকার হল সমাজ জীবনের সেই সব অবস্থা, যেগুলো ছাড়া ব্যক্তির প্রকৃষ্টতম বিকাশ সম্ভব হয় না। অধিকার একটি সামাজিক ধারণা। কারণ সমাজ জীবনের বাইরে অধিকারের কথা কল্পনাই করা যায় না।

wewfb ai‡ণi AwaKvi ev, AwaKv‡ii প্রকারভেদ t (Different types of Rights)

অধিকারকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - (ক) নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার। সামাজিক ন্যায়নীতি বোধের ওপর ভিত্তি করে যে সব অধিকার গড়ে উঠেছে, সেগুলোকে নৈতিক অধিকার বলে। কিন্তু যেসব অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেগুলোকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এইগুলো হল - (ক) পৌর অধিকার, (খ) সামাজিক অধিকার, (গ) রাজনৈতিক অধিকার এবং (ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার।

‡cŠi AwaKvi t (Civil Rights)

যে সব সুযোগ-সুবিধা ছাড়া মানুষ সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপন করতে পারেনা এবং যে সুযোগ ছাড়া পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়, সেই সব সুযোগ-সুবিধাকে পৌর অধিকার বলা হয়। যেমন - জীবনের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার। ধর্মের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি।

mvgvwRK AwaKvi t (Social Right)

নাগরিকদের সামাজিক জীবন সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সামাজিক সুযোগ-সুবিধাকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। যেমন - শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, সুস্থ পরিবেশে বসবাসের অধিকার ইত্যাদি।

ivR‰bwZK AwaKvi t (Political Right)

রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রত্যক্ষ বা, পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করাকে বোঝায়। যেমন - ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সমালোচনার অধিকার, আন্দোলনের অধিকার ইত্যাদি।

A_‰bwZK AwaKvi t (Economic Rights)

অর্থনৈতিক অধিকার হল সেইসব অধিকার, যেগুলো অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও নিরাপদ করে তোলে। যেমন ঃ কাজের অধিকার, অবকাশের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি।

AwaKv‡ii Drm Kx? (Where do Right come from?)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ মনে করতেন যে, অধিকারের উৎস প্রকৃতি বা, ঈশ্বর । প্রাকৃতিক নিয়মকানুন থেকেই মানুষের অধিকারের সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হল মানুষের অধিকার কোন রাষ্ট্র, সমাজ বা, শাসকের দ্বারা সৃষ্টি নয়। মানুষ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অধিকারগুলো অহস্তান্তরযোগ্য, কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। ইংরেজ দার্শনিক জন লক মানুষের তিন ধরণের প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলেছেন। এগুলো হল - জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার। এই অধিকারগুলো থেকেই অন্যান্য অধিকার সৃষ্টি হয়।

AwaKv‡ii cKwZ t (Nature of Right)

অধিকারের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে অধিকারের কয়েকটি দিক পাওয়া যায়, যেগুলো অধিকারের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রয়েছে। অধিকার একটি সামাজিক ধারণা, অধিকার একটি আইনগত ধারণা, অধিকার অহস্তান্তরযোগ্য, অধিকারের বিশ্বজনীন ধারণা, তাছাড়া অধিকার একটি জন্মগত অধিকার।

gvbewaKvi I cKwZ t (Human Rights and Nature)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ১৯৪৮ খ্রিঃ ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার -এর বিশ্বঘোষণা পত্রে মানবাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। মানবাধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায়, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ তার সহজাত গুণাবলি, বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন ঘটাতে পারে। ডঃ উপেন্দ্র বক্সির মতে, মানবাধিকার হল "মনুষ্য প্রজাতির অধিকার" (Right of human species)। মানবাধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষন করলে কয়েকটি দিকের কথা বলা যায়, সেগুলো হল - মানবাধিকার বিশ্বজননী, অহস্তান্তরযোগ্য, স্বাভাবিক অধিকার, শাশ্বত অধিকার। মানবাধিকার একটি মনুষ্য প্রজাতির অধিকার, যা মানুষ হিসাবে সকলেই ভোগ করতে পারে।

iv‡ói cwZ bvMwiK‡`i `vqe×Zv ev KZe¨ t (Responsibility or Duties of citizen to state)

প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা বা, কর্তব্য রয়েছে - যেগুলো পালন করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়বদ্ধতাগুলো হল - আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা, ভোট প্রয়োগ করা, দেশের উন্নয়নে সাহায্য করা ইত্যাদি।

AwaKvi I `vqe×Zv t (Rights and Rsponsibility)

অধিকার হল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর পরিবেশ বা, সুযোগ সুবিধা। অধিকার ভোগ করতে গেলে কিছু কর্তব্য বা দায়বদ্ধতা ও পালন করতে হয়। অধিকার এবং দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য একই মুদ্রার দুটি পিঠ। একটিকে ছাড়া অন্যটি হতে পারে না। অধিকার ছাড়া কর্তব্য পালন যেমন বেমানান, তেমুনি কর্তব্য ছাড়া অধিকার ভোগ করাও বেমানান। তাই বলা যায় একটি অপরটির পরিপূরক।

gvb‡li ghv`v m¤ú‡K K›U-Gi aviYv t (Kant on Human Dignity)

এই জগতের সব কিছুরই একটা মূল্য বা, মর্যাদা রয়েছে। মানবজাতি অন্য সকলের তুলনায় একটি ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর ধারণা তুলে ধরেন। কান্টের মতে, যে কোন মানুষের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করার অর্থ হল, সেই ব্যক্তির সাথে নৈতিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা। কান্টের এই ধারণা যারা শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা, মানবাধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাদের কাছে একটা পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

ckgvb - 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১) একটি রাজনৈতিক অধিকারের উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ ভোটদানের অধিকার।

২) একটি সামাজিক অধিকারের নাম লেখো।

৩) একটি অর্থনৈতিক অধিকারের নাম লেখো।

৪) শিক্ষার অধিকার কী ধরনের অধিকার?

৫) সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার কোন্ ধরণের অধিকার?

৬) ভোটদানের অধিকার কোন্ ধরণের অধিকার?

৭) অবসরযাপনের অধিকার কোন্ ধরণের অধিকার?

৮) অধিকার কী?

৯) সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা কবে গ্রহণ করা হয়?

১০) অধিকারের সবচেয়ে প্রাচীন তত্ত্ব কোনটি?

১১) অধিকারের উৎস কী?

১২) No Rights without Duties, No Duties without Right (কর্তব্য ছাড়া কোন অধিকার নেই, অধিকার ছাড়াও কোন কর্তব্য নেই) - উক্তিটি কার?

১৩) ধর্মের অধিকার কোন্ ধরণের অধিকার?

ckgvb - 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) অধিকার কী?

২) সামাজিক অধিকার কাকে বলে?

৩) রাজনৈতিক অধিকার কাকে বলে?

৪) অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়

৫) পৌর অধিকার কী?

৬) অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৭) মানবাধিকার কী?

৮) শিক্ষার অধিকার কী?

ckgvb - 4

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।

২) রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য বা, দায়বদ্ধতাগুলো কী?

৩) অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪) মানবাধিকার কাকে বলে? মানবাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) অধিকার বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেকের নিকট অধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ?

২) কীসের ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন দাবী দাওয়াগুলো অধিকারে পরিণত হয়?

৩) কীসের ভিত্তিতে কতগুলো অধিকারকে বিশ্বজনীন অধিকার বলে মনে করা হয়?

৪) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য বা, তুলনামুলক আলোচনা করো।

৫) অধিকারের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬) "অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য বা, দায়িত্ব কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করো।

অথবা

"অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার দুটি পিঠ" - ব্যাখ্যা করো।

Iô Aa¨vq

bvMwiKZv

GB Aa¨vq †_‡K hv Rvbv hv‡e -

* নাগরিকতা কী? * পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা * নাগরিকদের অধিকার ভোগ , * নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি সমূহ, * ভারতে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, * নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে পার্থক্য, * নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে সাদৃশ্য, * সুনাগরিকতা, * সুনাগরিকতার অন্তরায় বা, প্রতিবন্ধকতা। * বিশ্বজনীন নাগরিকতার ধারণা, * নাগরিকতা বিলোপের কারণ, * নাগরিক ও জাতি।

bvMwiKZv (Citizenship)

নাগরিকতার সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বা, মত প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী, নাগরিক শব্দের অর্থ হল নগরবাসী। প্রাচীন গ্রিস এবং রোমে নগর রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের মধ্যে যারা প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করত কেবল একটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী সকল ব্যক্তিকে বোঝায়।

cY Ges mgvb m`m¨Zv t (Full and equal Membership)

একটি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের পূর্ণ নাগরিক বলা হয়। তারা সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। কখনো কখনো দেখা যায়, এক রাজ্য থেকে কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে মানুষ বসবাস করে, তাদের প্রতি বৈষম্য না দেখিয়ে তাদেরকে সমান সদস্য হিসাবে দেখতে হবে। অর্থাৎ, যারা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা তাদের সঙ্গে যারা অন্য রাজ্য থেকে এসেছে বা, যারা বহিরাগত তাদেরকেও সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কারণ তারাও নির্দিষ্ট দেশের অর্থাৎ, একই দেশের নাগরিক।

bvMwiK‡`i AwaKvi †fvM (Enjoy of Right)

কোনো দেশের নাগরিকরা অর্থাৎ, যারা পূর্ণ নাগরিক তারা দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অধিকার ভোগ করে থাকে। কিন্তু যারা আংশিক নাগরিক তারা রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া বাকী অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে। নাগরিকরা যেহেতু ভোট দেয়, তাই তারা তাদের অভাব-অভিযোগগুলো সরকারকে জানাতে পারে। প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে বা, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনের মাধ্যমেও নাগরিকদের দাবী-দাওয়া জানাবার অধিকার রয়েছে।

bvMwiKZv AR‡bi cwZ t (System of acquiring citizenship)

নাগরিকতা একটি বিশেষ মর্যাদা। কোনো ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করলেই তাকে নাগরিক বলা যায় না। এই নাগরিকতা অর্জন করতে হয়। নাগরিকতা অর্জনের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো হল - (ক) জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন - এই পদ্ধতিটিকে রক্তের সম্পর্কনীতি এবং জন্মস্থান নীতি - এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (খ)

রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন - এটি হল দ্বিতীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটিকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (অ) ব্যক্তিগত অনুমোদন এবং (আ) সমষ্টিগত অনুমোদন।

fviZxq bvMwiKZ AR‡bi c×wZ t (System of acquiring citizenship in India)

ভারতীয় সংবিধান চালু হওয়ার পর ১৯৫৫ খ্রিঃ নাগরিকতা আইন পাশ হয়। এই আইনে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হল। ভারতে - (ক) জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন, (খ) রক্তের সম্পর্ক নীতিতে নাগরিকতা অর্জন, (গ) নথিভুক্তকরণের দ্বারা নাগরিকতা অর্জন। (ঘ) দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন এবং (ঙ) কোণো অঞ্চল অন্তভূক্তির ফলে নাগরিকতা অর্জন - এই পদ্ধতিগুলো রয়েছে। বর্তমানে ২০২০ সালে নাগরিকতা অর্জনের একটি নতুন আইন, যার নাম C.A.A (Citizenship Amendment Act) -এর মাধ্যমে ও অনলাইনে প্রতিবেশী দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা যারা তাদের দেশে সংখ্যালঘু হিসাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তারা আবেদনের মাধ্যমে ভারতের নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। এটি চালু করে NDA সরকার।

bvMwiK I we‡`wki g‡a¨ cv_K¨ t (Difference between citizen and Alien)

রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের নাগরিক বলা হয় এবং বিদেশি বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বিশেষ কোন প্রয়োজনে নিজ রাষ্ট্র ছেড়ে অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করেছে। যে রাষ্ট্রে অ-স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, সেই রাষ্ট্রে ওই ব্যক্তি বিদেশী বলে গণ্য। নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলো হল -

ক) নাগরিকরা রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু বিদেশিরা স্থায়ী বাসিন্দা নয়।

খ) নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে।

গ) নাগরিকরা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরণের অধিকার ভোগ করে। অপর দিকে, বিদেশিরা কিছু অধিকার ভোগ করলেও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারেনা।

ঘ) নাগরিকদের অধিকার ভোগের বিনিময়ে কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। কিন্তু বিদেশিদের নিজরাষ্ট্র ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না।

ঙ) রাষ্ট্র নাগরিককে গুরুতর অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড দিতে পারে। কিন্তু কোন বিদেশিকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যায় না।

bvMwiK I we‡`wki g‡a¨ mv`k¨ t (Similarity between citizen and Alien)

নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি কিছু সাদৃশ্য ও রয়েছে - এইগুলো হল -

ক) নাগরিক ও বিদেশি উভয়েই যে রাষ্ট্রে বসবাস করে, সেই রাষ্ট্রের আইন কানুন মেনে চলতে হয়।

খ) রাষ্ট্র নাগরিক ও বিদেশি উভয়কেই নিরাপত্তা প্রদান করে।

গ) নাগরিকের মতো বিদেশিকেও রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত কর দিতে হবে।

ঘ) নাগরিক ও বিদেশি উভয়ই সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার, জীবনের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করে।

ঙ) রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করলে উভয়ই শাস্তি পেতে হয়।

bvMwiKZv we‡jv‡ci KviY (Causes of Cancellation of Citizenship) :

নাগরিকতা হল একটি বিশেষ মর্যাদা, নাগরিকতার জন্য কতকগুলো শর্ত মেনে চলতে হয়। তা না হলে নাগরিকতার বিলোপ ঘটে। নাগরিকতা বিলোপের কিছু কারণ রয়েছে, এই কারণগুলো হল- কোনো নাগরিক অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে, কোনো স্ত্রীলোক বিদেশিকে বিবাহ করলে, বিদেশে চাকুরি গ্রহণ করলে, বিদেশি উপাধি গ্রহণ করলে, শত্রু পক্ষে যোগদান করলে, দীর্ঘদিন দেশে অনুপস্থিত থাকলে, দেশদ্রোহিতা ইত্যাদি সকল কারণে কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব বিলোপ ঘটে থাকে।

mbvMwiKZv I mbvMwiKZvi c‡_ অন্তরায় (Good Citizen and some obstacles before Good Citezen) :

সুনাগরিকতা হল এক ধরণের নাগরিক যার মধ্যে বিবেকবোধ, আত্মসংযম ও বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ থাকে। যে নাগরিক সবসময় রাষ্ট্রের কাজে সাহায্য করে, দেশের আইনকানুন মেনে চলে, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তবে সুনাগরিকতার পথে কিছু অন্তরায় বা, বাধা থাকে, সেগুলো নাগরিককে সম্মুখীন হতে হয়। এই গুলো হল- নির্লিপ্ততা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ দলীয় মনোভাব, গণমাধ্যমের নিষ্ক্রিয়তা, অজ্ঞতা ইত্যাদি। এই সকল বিষয় গুলো সুনাগরিকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

wekRbxb bvMwiKZvi avivYv (Universal /Global) :

বর্তমানে পৃথিবী-ব্যাপী গণমাধ্যমের ব্যাপকতায় এবং ইন্টারনেটের দৌলতে সমগ্র পৃথিবী আজ প্রত্যেকের হাতের মুঠোয়। ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তে সংঘটিত কোন ঘটনার খবর জানতে এখন আর অপেক্ষা করতে হয় না। মুহূর্তে পৃথিবীর সকলেই সবকিছু জেনে যায়। বর্তমানে Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবী যেন একটি ছোটো গ্রামে পরিণত হয়েছে। কোথাও কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে বিভিন্ন দেশের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এক দেশের মানুষের দুঃখে অন্য দেশের মানুষ ব্যাথিত হয়। এইভাবে সারা পৃথিবীর মানুষ একাত্ব হয়ে পড়েছে। একেই বলা হয় বিশ্ব নাগরিকতা। বিশ্বনাগরিকতার প্রধান গুরুত্ব হল, এটি আর্ন্তজাতিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠে।

bvMwiK I RwZ (Citizen and Nation) :

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, নাগরিক বলতে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী সকল ব্যক্তিকে বুঝায়। লর্ড ব্রাইসের মতে, জাতি হল রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত একটি জনসমাজ যা বহি:শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বা মুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট। জাতি হল জনসমাজেরই এক চুরান্ত রূপ।

ckgvb :- 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১) কত সালে দালাইলামা প্রথম ভারতে আসেন? উ:–১৯৫৯ খ্রিঃ

২) কবে ভারতে ভোটাধিকার বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়?

৩) কত বছর বয়সে পূর্ণ নাগরিকতা লাভ করা যায়? ইঃ ১৮ বছর বয়সে।

৪) রাষ্ট্রে বহিরাগত কারা?

৫) "Citizenship and Social Class" - বইটি কার লেখা?

৬) কোন সালে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়?

৭) নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে ১টি সাদৃশ্য লেখো?

৮) পূর্ণ নাগরিক কাকে বলে?

৯) অসম্পূর্ণ নাগরিক কাকে বলে?

১০) মাদার টেরিজা কোন্ পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন?

১১) বিদেশিরা কোন্ অধিকারটি ভোগ করতে পারে না?

১২) কবে CCA (Citizenship Amendment Act.) পাশ হয়?

১৩) সু-নাগরিকের একটি গুণ লেখো।

১৪) সুনাগরিকতার পথে একটি বাধা লেখো?

১৫) জাতি কাকে বলে?

ckgvb :- 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি কাকে বলে?

২) নাগরিক কাদের বলা হয়?

৩) বিদেশি কাদের বলে?

৪) নাগরিকত্ব অর্জনের ২টি পদ্ধতি লেখো?

৫) সুনাগরিকতা কাকে বলে?

৬) সুনাগরিকতার পথে দুটি অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা লেখো।

৭) পূর্ণাঙ্গ নাগরিক কাকে বলে ?

৮) বিশ্বজনীন নাগরিকতা কাকে বলে?

৯) দ্বৈত নাগরিকতা কী?

ckgvb :- 4

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২) নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে সাদৃশ্যগুলো লেখো।

৩) নাগরিকতার বিলোপের কারণগুলো লেখো।

৪) সুনাগরিক কাদের বলা হয় ? সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী ?

ckgvb :- 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করো।

২) ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতি বা, বিধিসমূহ আলোচনা করো।

৩) বিশ্বজনীন নাগরিকতা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

সপ্তম অধ্যায়

RvZxqZvev`

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে-

* জাতি ও জাতীয়তাবাদ * জাতি গঠনের উপাদান * জাতীয়তাবাদের - পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি * জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার * জাতীয়তাবাদ ও বহুত্ববাদ * জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

RwZ I RvZxqZvev` : (Nation and Nationalism)

RwZ : (Nation)

লাতিন শব্দ **Natio** (নেশিও) থেকে - **Nation** শব্দটি এসেছে। ইংরেজী **Nation**- এর বাংলা প্রতিশব্দ হল জাতি। জাতি হল জনসমাজের এক চুড়ান্ত রূপ। জনসমাজের মধ্যে এক গভীর ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে জাতীয় জনসমাজের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় জনসমাজের মধ্যে সুগভীর রাজনৈতিক চেতনার জন্ম হলে সৃষ্টি হয় জাতি এবং রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে জাতি পরিপূর্ণতা লাভ করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, - "জাতি হল রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত একটি জনসমাজ, যা বহি:শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বা, মুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট"।

জাতীয়তাবাদ ঃ (Nationalism)

জাতীয়তাবাদ হল একটি মানসিক বা, ভাবগত ধারণা। কোনো জনসমাজ যখন ভাবগত ঐক্যবোধের ভিত্তিতে একাত্ম হয় এবং নিজেদের স্বতন্ত্রসত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম মিলিত হয়ে যে রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠে,তাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়। জাতীয়তাবাদ হল একটি মহান আদর্শ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে মানুষের মনে স্বজাতি এবং স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

RwZ MV‡bi Dcv`vb : (Factors of Nation)

জাতি গঠিত হয় কিছু প্রাথমিক উপাদানের সমন্বয়ে। জাতি গঠনের উপাদানগুলো হল-

1) †hŠ_ wekvm (Shared Beliefs)

   যৌথ বিশ্বাস বলতে, একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের জনগনের যৌথ রাজনৈতিক বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। রাজনৈতিক বিশ্বাস সকলের মধ্যে গড়ে উঠলে, তখন তারা জাতিতে পরিণত হয়। একটি জাতি যৌথ বিশ্বাসের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

2) BwZnvm (History)

   একটি জাতি গঠনের পিছনে তার সদস্যদের মধ্যে অতীতের ঐতিহাসিক পরিচয় কাজ করে থাকে। একটি জাতির ঐতিহাসিক পরিচিতি, ঐতিহ্য ওই জাতির সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে থাকে।

3) f-LÛ (Territory)

নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের দ্বারাও জাতি তার পরিচিতি লাভ করে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে একসাথে বসবাসকারী জনগোষ্টির প্রাচীন ইতিহাস ও সামগ্রিকভাবে একই হয় এবং এর মাধ্যমে জাতি হিসাবে সমষ্টিগত পরিচিতি লাভ করে, যা তাদের সমগোত্রীয় লোক হিসাবে নিজেদের ভাবতে শুরু করে।

4) ‡hŠ_ ivR‰bfZK gZv`k: (Shared political ideals)

একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকরা সমষ্টিগতভাবে এমন কিছু রাজনৈতিক নীতি আদর্শ নির্মাণ করে যে গুলো ওই জাতি রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। একটি জাতি শক্তিশালী হয়, যখন তার নাগরিকরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠে।

5) mgwóMZ ivR‰bwZK cwiPq: (Common political identity)

শুধুমাত্র যৌথবিশ্বাস, রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা জাতি গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রয়োজন সম-সাংস্কৃতিক পরিচিতি। সম-সাংস্কৃতিক পরিচিতি বলতে একই ভাষা ও সম আশা - আকাঙ্খাকে বোঝায়। একই ভাষা ধর্ম,সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে তুলে,যা জাতি গঠনে সাহায্য করে।

RvZxqZvev‡`i mg_‡b hw³ : (Reason in favour of Nationalism)

জাতীয়তাবাদের পক্ষে কিছু যুক্তি রয়েছে, সেগুলো হল-

1) GKwU gnvb Av`k:

জাতীয়তাবাদ একটি মহান আদর্শ হিসাবে সমগ্র জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে দেশের স্বার্থে ব্যক্তি আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়।

2) gw³Kvgx †`‡ki পক্ষে Avkxev`:

জাতীয়তাবাদের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরাধীন জাতিসমূহ মুক্তির জন্য মরনপণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

3) gvbemf¨Zvi weKv‡k mnvqK:

জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতির অন্তর্নিহিত গুণাবলির উন্নতিসাধন করে মানবসভ্যতার বিকাশে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলে।

4) আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক:

আদর্শ জাতীয়তাবাদের মূল মন্ত্র হল- “নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও” । আদর্শ জাতীয়তাবাদ অন্য জাতির সম্প্রীতি বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে। তাই জাতীয়তাবাদ হল আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক।

5) h‡×i m¤¢vebv nvm:

আদর্শ জাতীয়তাবাদ জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। তাই পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

6) জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যুক্তি :

কিছু কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন, সেগুলো হল -

K) mv¤vR¨ev‡`i RbK : বিকৃত জাতীয়তাবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের জনক। ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো জাতিয়তাবাদের উন্মাদনায় উন্মুত্ত হয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দুর্বল রাষ্ট্রে সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

L) বিশ্বশান্তি বিরোধী : বিকৃত জাতীয়তাবাদ হল বিশ্বশান্তির বিরোধী। কেননা এর ফলে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ন্যায় - নীতি, আলাপ - আলোচনার পরিবর্তে যুদ্ধের পথ গ্রহণ করা কী সঠিক বলে মনে করা হয়।

M) mf¨Zvi msKU : বিকৃত জাতীয়তাবাদ জাতির মনে নিজের জাতি সর্ম্পকে গর্ববোধ এবং অপর জাতির প্রতি ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করে। এরফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত হয়। তাতে সভ্যতা এক ঘোরতর সংকটের সম্মুখীন হয়।

N) m¯ ms¯wZ we‡ivax : বিকৃত জাতীয়তাবাদ সবসময় নিজের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের জন্য তারা অন্যের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

O) MYZš we‡ivax : পুঁজিবাদী সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার অকাঙ্খায় জাতিয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলো সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার মতো গণতান্ত্রিক আদর্শগুলোকে হত্যা করে থাকে।

RwZi AvZwbqš‡Yi AwaKvi : **(National Self Determination)**

১৭৭২ খ্রী: পোল্যান্ডের বিভক্তিকরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আলোচনা শুরু হয়। ১৯১৭ খ্রী: লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসাবে ঘোষণা করেন যে, জার শাসিত অত্যাচারিত জাতিগুলোকে স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে। ১৯১৪ খ্রী: মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করেন। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন জনস্টুয়ার্ট মিল।

- আত্মসচেতন প্রতিটি জাতির স্বতন্ত্র সত্ত্বা এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার বলে। এই তত্ত্বটি “এক জাতি এক রাষ্ট্র” - এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু যুক্তি রয়েছে। সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল-

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি : **(Resons for National Self Determaination)**

১) RwZi গুণাবলির weKvk :

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও সত্তা থাকে। প্রতিটি জাতিই চায় নিজস্ব পদ্ধতিতে এই সব জাতীয় গুণাবলিকে বিকশিত করতে, যা একমাত্র জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রেই সম্ভব।

2) b¨vqm½Z :

বহুজাতিক রাষ্ট্র সবল ও উন্নত জাতিগুলোর দ্বারা দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলো নিয়ন্ত্রিত ও নির্যাতিত হয়। এক জাতীয় রাষ্ট্র হলে এই অনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

3) M¶ZŠ m¤§Z :

মিলের মতে, - গণতন্ত্রের সাফল্যের অপরিহার্য্য শর্ত হল- আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জাতিগুলো কখনো সরকার গঠনের সুযোগ পায় না। ফলে সংখ্যালঘুদের অধিকার উপেক্ষিত হয়।

4) miKvi ¯vqx nq :

একজাতিক রাষ্ট্রে শাসিতের সম্মতির উপর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সরকারের প্রতি শাসিতের অনুগত্য থাকে। এতে সরকারের স্থায়িত্ব ও সাফল্য নিশ্চিত হয়।

5) wg‡ji e³e¨ :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মিলের মতে, - "জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া উচিত"- বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা কখনো সরকার গঠনের সুযোগ পায় না।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তি : **(Reasons against national self sefermination)**

জাতীর আত্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে যুক্তিগুলো হল -

1) RbmgvR AbMmi n‡e:

একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটে, যা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে অসম্ভব।

2) mxgvnxb `vwe:

লর্ড কাজনের মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত্ত্বটি করাতের মতো। এটা একদিকে যেমন ঐক্যবন্ধ করছে, অন্যদিকে বিছিন্ন হতে প্রেরণা দিচ্ছে।

3) বাস্তব প্রয়োগ সম্ভবঃ

অনেকের মতে, এই নীতির প্রয়োগ সম্ভব ও নয়, উচিত ও নয়। বহুজাতিক রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে উঠে, এই নীতি প্রয়োগ হলে ঐক্য বিনষ্ট হবে।

4) ivR‰bwZK I A_‰bwZK mgm¨vi mwó:

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হলে নতুন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন হতে পারে। আর, তা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করবে।

5) enr ivó¸‡jv †f‡½ hv‡e:

পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো বহুজাতিক সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই নীতি অনুসারে, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হলে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো ভেঙ্গে যাবে। ফলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে।

RvZxqZvev` I eûZev` : (Naationalism and Pluralism)

জাতীয়তাবাদ ধারণাটি বহুত্ববাদ ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বহুত্ববাদীদের মতানুসারে মানুষ হল সামাজিক জীব। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বিকশিত হয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে । এই সমস্ত সংগঠন মানব সমাজে স্বতস্ফুর্ত ভাবে গড়ে উঠে। এই মতবাদ অনুসারে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা চরম ও অসীম নয়। সমাজের অনান্য সংগঠনসমূহও রাষ্ট্রের মতই স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের মতো এরাও সার্বভৌম। বহুত্ববাদে রাষ্ট্রকে কোন উচ্চতর মূল্য বা মর্যাদা দেওয়া হয় না।

RvZxqZvev‡`i mgv‡jvPbvq iex›`bv_ : (Rabindranath on Criticism of Nationalism)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবলমাত্র সাহিত্য জগতের একজন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন না, রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি তাঁর "Nationalism" গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পাশ্চাত্য দেশ ও জাপানের জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক আগ্রাসী চরিত্রের উদ্দেশ্য হল-

সমগ্র বিশ্বকে শোষণ করা ও নিজ শাসনাধীনে আনা। তাঁর মতে, ইতিহাসের প্রথম থেকেই ভারতে জাতপাত ও স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা চলে আসছে এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত এটিই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- তিনি কোনো একটি বিশেষ জাতির বিরুদ্ধে নন, কিন্তু তিনি নেশন এর ধারণার বিরুদ্ধে। কারণ, তিনি মনে করেন ঐক্য, মানবতা,ভ্রাতৃত্বের ধারণা এবং সৃজনশীলতাই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের গতিপথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদকে সভ্যতার সংকট বলে গণ্য করেন।

ckgvb- 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১) জাতি কী?

২) জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্ম কখন হয়?

৩) ইতালির জাতীয়তাবাদের জনক কে?

৪) নেশন (Nation) শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

৫) ভারত কবে জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে? উঃ- ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ আগষ্ট

৬) ফ্যাসিবাদের জনক কে?

৭) নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও" - এটি কোন্ মতবাদের মূলকথা?

৮) Nationalism" - গ্রন্থের লেখক কে?

৯) এক জাতি এক রাষ্ট্র " - ধারণাটির প্রবক্তা কে?

১০) জাতীয়তাবাদের রাজপথ ধরেই আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছানো যায়" - কথাটি কে বলেছেন?

১১) আন্তর্জাতিকাকে কে 'কাপুরুষের স্বপ্ন' বলে মনে করতেন কে?

১২) "জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" মতবাদটির প্রবক্তা কে?

১৩) 'নেশন' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?

১৪) কখন জাতি রাষ্টের ধারণার উদ্ভব ঘটে?

১৫) আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ কী?

১৬) বিকৃত জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা কে?

১৭) "জাতীয়তাবাদ সভ্যতার শত্রু" - কে বলেছেন?

১৮) "Discovery of India" বইটির লেখক কে?

১৯) কোন্ ধরণের জাতীয়তাবাদ "মানব সভ্যতার বা আন্তর্জাতিকতার শত্রু"?

ckgvb - 2

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১) জাতি গঠনের দুটো উপাদানের নাম লেখো?

২) জাতীয়তাবাদ কী?

৩) জনসমাজ কাকে বলে?

৪) বিকৃত জাতীয়তাবাদ কী?

৫) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কী বোঝ?

৬) বহুত্ববাদ কী?

৭) জাতীয়তাবাদী ধারণার দুইজন প্রবক্তার নাম লেখো।

প্রশ্নমান - ৪

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে চারটি যুক্তি দাও?

২) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিপক্ষে চারটি যুক্তি দাও।

৩) জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪) জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি লেখো?

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১) জাতীয়তাবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

২) "বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার সংকট ডেকে আনে"- ব্যাখা করো?

বা

জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে যুক্তি দেখাও?

৩) জাতি গঠনের উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো?

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতা

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে-

* ধর্মনিরপেক্ষতা কী? * ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী * আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব * অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব * ধর্ম নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণা * ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরুর মতামত * ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা।

ধর্মনিরপেক্ষতা কী? (What is Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি আদর্শগত ধারণা যা বাস্তবে একটি নিরপেক্ষ সমাজ বা, আন্তঃধর্মীয় অথবা আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব বিহীন সমাজ প্রত্যাশা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ভিত্তি। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিতে বিশ্বাসী সকল মানুষ অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, সহনশীল হবে। এই শ্রদ্ধাও সহনশীলতাই প্রত্যেক ধর্মীয় সম্পদায়ের মানুষের একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একসূত্রে বাঁধতে সাহায্য করে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কী (What is Secular State)

যে রাষ্ট্র কোন নির্দিষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা বা, স্বীকৃতি দেয় না, যেখানে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করতে পারে, সেই রাষ্ট্রেকে ধর্মনিরপেক্ষ" রাষ্ট্র বলে। যেমন ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতে সকল ধর্মের মানুষ বসবাস করছে এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে পারছে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে কোনো ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করে না। সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করছে। তাই ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়।

অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব : (Inter religious Domination)

একটি সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায় যখন কেবল নিজেদের ক্ষমতার গর্বে অন্য একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর কর্তৃত্ব করে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তাকে অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৮৪ খ্রিঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিখদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং ২৭০০ জন শিখকে হত্যা করা হয়। ২০০২ সালে গুজরাটে প্রায় ১০০০ নাগরিককে হত্যা করা হয়, যাদের বেশীর ভাগই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়।

আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্বঃ (Intra religion Domination)

একই ধর্মের মধ্যে বিভেদ যখন সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্য হয়ে থাকে, সেই বিভেদকে আন্তঃ ধর্মীয় কর্তৃত্ব বলে। একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ জাতের মানুষ যখন নীচু জাতের মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের ধর্মীয় আচরণের ওপর বিধিনিষেধ জারি করে, তখন তাকে আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতে হিন্দুধর্মের দলিত সম্প্রদায়ের মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশ বাধাদান করে। যেমন সবরমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধের ঘটনাটি একটি অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণা: (The Western Model of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জায়গাতেই আছে। পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা হল চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীকরণ। পাশ্চাত্য ধারণা অনুয়ায়ী চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণই হল ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না,তেমনই ধর্মীয় সংগঠনও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকে।

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য: (Futures of Western Secularism)

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১) রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

২) ধর্মকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র কোনো রাষ্ট্রীয় নীতি প্রনয়ন করবে না।

৩) রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্টানকে সাহায্য করবে না, এমনকি আর্থিক সাহায্যও করবে না। ধর্মের দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও আর্থিক সাহায্য করবে না রাষ্ট্র।

৪) ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো রাষ্ট্রীয় নীতির সীমানার মধ্যে থেকে কাজ করে থাকে।

৫) যদি কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোককে মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তাহলে রাষ্ট্র সেখানে কিছুই করতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতীয় রূপ : (The Indian Model of Secularism)

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি পাশ্চাত্যের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই বহু ধর্ম, বর্ণের মানুষের বসবাস, ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পারস্পারিক বোঝাপড়াও গড়ে উঠেছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সকল ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করা, সমান মর্যাদা প্রদান করা এবং কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আচরণ না করা। এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষার নীতিটি ১৯৭৬ খ্রি: ৪২ তম সংবিধানের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য : (Feature of Indian Secularism)

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হল-

১) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিটি মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে শেখায়।

২) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে না, বরং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাও স্বীকার করে।

৩) এখানে প্রতিটি মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী ধর্মপালন করতে পারে।

৪) ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় ধর্মের সংস্কাররের সঙ্গেও যুক্ত।

৫) ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কারকে আইনে পরিণত করার জন্য সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্র ভূমিকা পালন করে। যেমন বিধবা

বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে আইন পাশ করা হয়েছে।

৬) সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক অধিকারটি সংযোজন করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরুর মতামত : (Nehru's view on Secularism)

নেহেরু চেয়েছিলেন এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে সফল ধর্ম সম্প্রদায়কে সমানভাবে সংরক্ষণ করা যাবে। কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে না এবং রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেবে না। নেহেরু ছিলেন ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার দার্শনিক। তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোনো ধর্মের প্রতি শত্রুতা করা নয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি তুর্কির কামাল আতাতুর্ক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। তাঁর মতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমাজ সংস্কার করার জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

নেহেরু নিজে বিভিন্ন আইন প্রনয়ণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেমন - পণপ্রথা নিবারণ, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, জাতিভিত্তিক বৈষ্যমের অবসান ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেহেরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বুঝতেন - সমস্ত ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা। তাঁর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো আদর্শ বা নীতি নয়, এটি হল ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির একটি নিশ্চয়তার স্বরূপ।

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা :

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা বিভিন্ন দিক থেকে কঠোর সামালোচিত হয়-

১) ধর্মবিরোধী: (Anti religious)

সমালোচকরা মনে করেন, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মবিরোধী। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রতি হুমকি স্বরূপ। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা কিছু ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে দমন করার চেষ্টা করে।

২) পাশ্চাত্য আমদানি: (Western Import)

অনেকে মনে করেন, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা যেহেতু খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই ভারতে পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা বেমানান।

৩) সংখ্যালঘুবাদ: (Minoritism)

অনেকে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংখ্যালঘু তোষণের নীতি হিসাবে অভিযোগ করেন। এটা সত্য যে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারকে সংরক্ষণ করে।

৪) হস্তক্ষেপবাদী: (Interventionist)

অনেক সমালোচক মনে করেন, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে দমনমূলক এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার ওপর অনেক বেশি হস্তক্ষেপ করে থাকে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম সংস্কারের অনুমতি দেয়, যা অনেকের মতে ঠিক নয়।

৫) ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি: (Vote Bank Politics)

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ রয়েছে যে, এটি ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিকে উৎসাহিত করে। অনেক সময়, ধর্মের নামে, জাতের নামে ভোট চাওয়া হয়।

৬) অসম্ভব প্রকল্প (Impossible project) ঃ-

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বশেষ সমালোচনাটি হল, এটি কোনো কাজই করতে পারে না, কারণ এর প্রত্যাশা সীমাহীন ।

ckgvb - 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১. একটি অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বের উদাহরণ দাও ।

২. একটি অভ্যন্তরীন ধর্মীয় কর্তৃত্বের উদাহরণ দাও ।

৩. কততম সংবিধান সংশোধনে "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দটি যুক্ত করা হয়?

৪. "রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে সমানভাবে সংরক্ষণ" উক্তিটির কার ?

৫. ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার দার্শনিক কাকে বলা হয় ?

৬. তুর্কিতে ধর্মনিরপেক্ষতার জনক কে ?

৭. আতাতুর্ক শব্দের অর্থ কী?

৮. ভারতে শিখ বিদ্বেষী দাঙ্গা কবে হয়েছিল ?

৯. গোধরা কান্ড কবে সংঘটিত হয় ?

১০. বাবরি মসজিদ কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

১১. 2টি ধর্মনিরপেক্ষ রষ্ট্রে বা দেশের নাম লেখো।

১২. ধর্মনিরপেক্ষতা কী ?

ckgvb - 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১. ধর্মনিরপেক্ষতা কী ?

২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে ?

৩. অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব কী ?

৪. অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব কী ?

৫. ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি কী ?

৬. ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণাটি কী?

৭. হস্তক্ষেপবাদ কী ?

ckgvb - 4

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১. ভারত কী একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও ।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরুর মতামত কী ছিল ?

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা কী ধর্মবিরোধী ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও ।

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১. ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণাটি আলোচনা করো।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ভারতীয় ধারণাটি আলোচনা করো।

৩. ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে পার্থক্যগুলো কী?

নবম অধ্যায়

শান্তি

এই অধ্যায় থেকে যা জানা যাবে -

** শান্তির অর্থ কী ? শান্তিবাদ কী
** কাঠামোগত সহিংসতার ধরণ
** সহিংসতা দূরীকরণ
** সহিংসতা কী কখনো শান্তির সহায়ক হতে পারে
** গান্ধিজীর অহিংস নীতি
** শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
** শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমসাময়িক বাধাসমূহ

* শান্তির অর্থ কী (What is the meaning of Peace) ঃ-

যুদ্ধহীন পরিস্থিতিকেই শান্তি বলে । এই সংজ্ঞাটি বিভ্রান্তকর। কারণ, দুটো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়াও দেশে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার মত অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয় । তাই বলা যায়, শান্তি হল সকল প্রকার সংঘর্ষ যেমন যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণহত্যা, গুপ্ত হত্যা অথবা যে কোন প্রকারের শারীরিক আক্রমণের অনুপস্থিতি । এক কথায় বলা যায়, শান্তি হল অহিংসার বাতাবরণ যা সমাজে বসবাস করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ।

* শান্তিবাদ কী (What is Pacifism) ঃ-

'Pacifism (প্যাসিফিজম) কথাটির উৎস ফরাসি। শান্তির প্রচার শব্দ থেকে ফরাসি শান্তির প্রচারক এমিলি আরনল্ড "প্যাসিফিজম" কথাটি ব্যবহার করেন । প্যাসিফিজম শব্দটিকে মূলত অহিংসা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । যে অহিংসা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র । এক কথায়, শান্তিবাদ হল হিংসাকে প্রতিরোধ করা। শান্তিবাদ সংকট নিরসনের মাধ্যম হিসাবে যুদ্ধ কিংবা সংঘর্ষ বিরোধী বিকল্পগুলো সম্পর্কে প্রচার করে । নীতিগতভাবে শান্তিবাদ এমন বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়, যা মনে করে যুদ্ধ, মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার অথবা বল প্রয়োগ জনিত যে কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপ নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ অন্যায় ।

কাঠামোগত সহিংসার ধরণ ঃ (Forms of Structural Violence) ঃ-

হিংসা কেবল যুদ্ধ বা যুদ্ধময় পরিস্থিতি নয়, হিংসার সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি আরো ভিন্নভাবে হতে পারে । কাঠামোগত সহিংসার ধরণগুলো হল নিম্নরূপ ঃ-

(i) জাতিভেদ প্রথা ঃ-

জাতিভেদ প্রথা ভারতে কাঠামোগত সহিংসার একটি ধরণ। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সমাজের বুকে জাতিভেদ প্রথার বীজ বোনা হয়েছিল, যা বর্তমান ভারতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ এইগুলোর মধ্যে হিংসা বিরাজ করে ।

(ii) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ঃ-

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হল ভারতে সহিংসার অপর একটি কাঠামো । পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে

ভারতে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। তাছাড়া কণ্যাভ্রুণ হত্যা, মেয়েদের প্রতি যত্নহীনতা, শিক্ষায় উদাসীনতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা প্রচলন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা ইত্যাদি দিন দিন বাড়ছে ।

(iii) ঔপনিবেশিক শাসন ঃ-

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা সহিংসার একটি কাঠামো, যার মধ্যে হিংসা দেখা যায় । ভারত যখন পরাধীন ছিল, তখন ভারতে প্রায়ই অশান্তির পরিবেশ গড়ে উঠত। তার একমাত্র কারণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতীয়রা আন্দোলনে সামিল হতো, যা ছিল অশান্তির পরিপন্থী । আবার, ইংরেজরাও ভারতীয়দের দমনমূলক নীতির মাধ্যমে দমন করার সময় দেশে শান্তি বিঘ্ন হত।

(iv) উগ্রজাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ঃ-

উগ্রজাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ ছাড়াও দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে । যেমন, হিটলারের জার্মানি কর্তৃক ইহুদিদের গণহত্যা, আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দাসত্ব প্রথায় আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি ঘটনা দেশের মধ্যে অস্থিরতা গড়ে তুলেছিল এবং একটি অশান্তির বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল ।

* সহিংসতা দূরীকরণের উপায় (Way to eliminate violence) ঃ-

UNESCO-র সংবিধান সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে "যেহেতু যুদ্ধের উৎস হল মানুষের আত্মা, সেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানুষের আত্মাতেই সংগঠিত হবে"। লক্ষ্য করা যায়, সহিংসতা শুধুমাত্র ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিকতা থেকে সৃষ্টি হয় না, তা সমাজের কাঠামোতেই রয়েছে। একটি ন্যায়পরায়ণ ও গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের দ্বারাই কাঠামোগত সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্ভব । শান্তি হল বিভাজিত মানুষের সুষম সহাবস্থানের ফলশ্রুতি । এটা কখনোই সকলের জন্য একটি পর্বে অর্জন করা যাবে না । শান্তি নিজে সর্বশেষ কথা নয়, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণে শান্তি হল একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সকল প্রকারের নৈতিক এবং বাস্তবিক উপাদানগুলো সমষ্টিগতভাবে মানুষের সার্বিক কল্যানসাধন করে ।

* সহিংসতা কী কখনো শান্তির সহায়ক হতে পারে ? (Can violence ever promote peace) ঃ-

সহিংসতাকে অশুভ বলা হলেও অনেকসময় সহিংসতা শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যুক্তি হিসাবে বলা যায়, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সহিংস আন্দোলন প্রয়োজন । নির্যাতিত মানুষের সহিংস মুক্তি আন্দোলন এক্ষেত্রে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয় । তবে, কখনো কখনো সহিংসতা একবার শুরু হয়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং শুরু হয় ধ্বংস লীলা এবং মৃত্যুর মিছিল ।

* গান্ধিজীর অহিংসনীতি (Mahatma Gandhi on Non-Violence) ঃ-

সাধারণত আমরা অহিংসা বলতে আঘাত না করাকে বুঝি, যা শারীরিক আঘাতকে উৎসাহিত করে না, তা-ই অহিংস । এই অর্থে গান্ধিজী অহিংসাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁর মতে, অহিংসার অর্থ শুধু দৈহিক আঘাত থেকে বিরত হওয়া নয়, বরং মানসিক আঘাত অথবা জীবন জীবিকার ক্ষতি থেকেও দূরে থাকা । এমনকি কাউকে আঘাত করার মানসিকতা পরিত্যাগ করাও অহিংসা । তিনি আরো বলেন, "আমি যদি অন্যজনকে আঘাত করতে কাউকে সাহায্য করি অথবা যে কোনো সহিংস কর্ম দ্বারা লাভবান হই, তাহলে আমি হিংসার অভিযোগে অভিযুক্ত হব"। গান্ধিজীর অহিংস নীতির দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি আরো বেশী ইতিবাচক । যেমন, কাউকে আঘাত করার কারণ না হওয়াই যথেষ্ট নয় ।

অহিংসতার জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতা । তিনি আরো মনে করতেন, অহিংসার অর্থ হল সকলের জন্য কল্যাণ এবং সুন্দরের প্রত্যাশা করা । অহিংসা হল একটি সক্রিয় ও অদম্য শক্তি, যার মধ্যে ভীরুতা বা কাপুরুষতার কোনো স্থান নেই।

**শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Different Approaches to the Pursuit of Peace) ঃ-

শান্তি হল কোনো দেশের উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি । তাই দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দেশের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে । এই কৌশলগুলোকে তিন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় । সেগুলো হল----

(i) প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি ঃ-

রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকতা ও সার্বভৌমিকতা সমর্থন ও সম্মান করে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে । এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা।

(ii) দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঃ-

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধকে মান্যতা দেয় । কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয় । রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্টা করা সম্ভব । এই ধরণের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করে । ফলে বিশ্বব্যাপী বিরোধ হ্রাস পায় ।

(iii) তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঃ-

প্রথম দুই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মনে করে মানব ইতিহাসের ক্ষয়িষ্ণু পর্ব । এটি জাতি রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে এমন এক ব্যবস্থার প্রত্যাশা করে, যা সকল মানুষকে বিশ্বের একটি সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিপালন করে নিশ্চিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে সাহায্য করে ।

* শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমসাময়িক বাধা সমূহ ঃ-

শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধাগুলো হল,

i) রাষ্ট্রসংঘ এই বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারলেও বিশ্বে চিরতরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন শক্তিশালী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থকে বজায় রাখায় জন্য জোট গঠন করেছে। এই জোটবদ্ধ দেশগুলো কোনো বিদেশী ভূখন্ডকে দখল এবং অন্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালাতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ii) বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের উত্থানের পেছনে সবচেয়ে দায়ী যুদ্ধবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থপরতা এবং দায়সারা আচরণ । বর্তমানে সন্ত্রাসবাদীরা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের সুনিপুণ এবং নির্মম ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইসলাম সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে) ধ্বংস করার কথা বলা যায়।

iii) সন্ত্রাসবাদীদের গেরিলা কৌশল এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার লালসা দমন করতে বিশ্ব সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়েছে। কোনো গোষ্ঠীর সকল মানুষকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস কিংবা গণহত্যা করা হলে বিশ্ব সম্প্রদায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এতে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পৃথিবীতে শান্তি নষ্ট হয়।

iv) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে। কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে শায়েস্তা করার জন্য সকল দেশ একসঙ্গে এগিয়ে আসে না। বিশ্বশান্তি নষ্টের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে অনৈক্য একটি বড় বাধা।

v) বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হল রাষ্ট্রসংঘের ভেটো ক্ষমতা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্যের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। একটি দেশ ভেটো প্রয়োগ করলেই আর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই বিশ্বশান্তির স্বার্থে অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতা বাতিল করা প্রয়োজন।

ckgvb - 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vI t

১. কিউবা কোন্ মহাদেশে অবস্থিত ?

উত্তর ঃ উত্তর আমেরিকা।

২. বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ কোনটি ?

উত্তর ঃ কিউবা।

৩. ঠান্ডা লড়াই শব্দটিকে কে জনপ্রিয় করে তোলেন ?

৪. ঠান্ডা যুদ্ধ কথাটি প্রথম কবে ব্যবহৃত হয় ?

৫. ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটে কবে ?

৬. দ্বিমেরু রাজনীতির অবসান ঘটে কবে ?

৭. কবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় ?

৮. NATO কবে গঠিত হয় ?

৯. শান্তি কী ?

১০. শান্তির স্বপক্ষে একজন প্রবক্তার নাম লেখো।

১১. UNESCO-এর সম্পূর্ণ নাম কি ?

১২. UNESCO-এর সদর দপ্তর কোথায় ?

১৩. ভেটো কথার অর্থ কী ?

১৪. কবে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রমণ হয়েছিল ?

১৫. বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রটি কোন্ দেশে অবস্থিত ?

১৬. কবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভাজন ঘটে ?

১৭. মার্টিন লুথার কে ?

১৮. কোন্ দেশ জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ?

১৯. কবে কিউবা মিসাইল সংকট ঘটেছিল ?

ckgvb - 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১. শান্তি কী ?

২. শান্তিবাদ কী ?

৩. দ্বিমেরুকরণ কী ?

৪. শান্তির ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

৫. সহিংসা দূরীকরণে UNESCO-এর ভূমিকা কী ?

৬. কাঠামোগত সহিংসার ধরণ বলতে কী বুঝ ?

ckgvb - ৪

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১. শান্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

২. শান্তিবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩. গান্ধিজীর অহিংস নীতি আলোচনা করো।

৪. সহিংসা দূরীকরণের উপায়গুলো কী কী ? সহিংসা কী কখনো শান্তির সহায়ক হতে পারে ?

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

১. কাঠামোগত সহিংসার ধরণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো।

বা

যুদ্ধ ছাড়াও কীভাবে পৃথিবীতে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হতে পারে বলে তুমি মনে করো।

২. শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমসাময়িক বাধা বা চ্যালেঞ্জগুলো কী কী ?

৩. শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আলোচনা করো।

দশম অধ্যায়

Dbqb

** উন্নয়ন কী ?
** উন্নয়নের সামাজিক মূল্য
** উন্নয়নের বিকল্প ধারণা
** উন্নয়ন ও জীবনযাত্রা
** উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা
** উন্নয়নের পরিবেশগত মূল্য
** গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ
** পরিবেশবাদ কী ?
** উন্নয়নের মডেলের সমালোচনা
** উন্নয়নের মূল্যায়ণ
** নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন
** কেন্‌সারো-উইয়ার আন্দোলন

* Dbqb Kx ? (What is Development) t-

উন্নয়ন হল এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা অগ্রগতি, ইতিবাচক পরিবর্তন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ও পরিবেশগত উপাদানের সংযুক্তিকরণ ঘটায়। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন। তবে এই উন্নতি বৃদ্ধি করতে গিয়ে যেন পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না হয় তা লক্ষ রাখতে হবে ।

* Dbq‡bi cavb cwZeÜKZv (The challenge of Development) t-

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উন্নয়নের ধারণা গুরুত্ব লাভ করে । সে সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলো রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেশি উন্নত ছিল না বলে বেশির ভাগ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান ছিল নিম্নমুখী। এমনকি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার যথেষ্ঠ অভাব ছিল। ফলে এই দেশগুলোকে সে সময় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা হত । 1950-60 এর দশকে এশিয়া–আফ্রিকার দেশগুলো যখন ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে সবে মাত্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তখন তাদের সামনে প্রধান কর্তব্য ছিল দরিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতার মতো সমস্যাগুলোর সমাধান করা ।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর সামনে উন্নয়নের একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা দেশীয় সম্পদ জনগণের স্বার্থে ব্যবহার না করে শুধু নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। যার ফলে দেশের অনেক সম্পদ বিদেশে চলে যায়। ফলে দেশে সম্পদের ঘাটতি দেখা দেয়। এইভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সম্পদ চলে যাওয়াকে সম্পদের নির্গমণ বলা হয়। যেমন - ইংরেজরা ভারত থেকে প্রচুর কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পাচার করেছিল। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারত উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে পড়েছিল।

* Dbqb g‡W‡j i mgv‡jvPbv (Criticism of Development Model) t-

সমালোচকদের মতে, যে সকল উন্নয়ন মডেল বিভিন্ন রাষ্ট্রদ্বারা গৃহীত হয়েছে, সেগুলো উন্নয়নশীল দেশ সমূহের জন্য অত্যন্ত ব্যয় বহুল বলে প্রমাণিত হয়েছে । এইরূপ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয়ের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশ

দীর্ঘমেয়াদী ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে । সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ এখনও সীমাহীন ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ফলে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে উন্নয়ন লক্ষ্যের কোন প্রকার সামঞ্জস্য থাকছে না এবং দারিদ্র ও মহামারির মতো বিপর্যয় সমগ্র মহাদেশকে গ্রাস করেছে ।

* Dbq‡bi mvgvwRK gj¨ t (The Social Costs of Development) t-

উন্নয়নের সামাজিক মূল্য অপরিসীম । উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিশাল বাঁধ নির্মাণ, শিল্প কারখানা স্থাপন, খনন কার্য এবং অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে অনেক মানুষ তাদের এলাকা ও ঘর ছাড়া হয়েছে । ফলে তাদের জীবন জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায় । উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে অনেক সময় কৃষি জমি হারিয়ে কৃষকরা দুর্দশায় পড়ে । ফলে তারা পেশা হারিয়ে বেকারে পরিণত হয় । অনেকে বাড়িঘর, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে এবং জীবনে নেমে আসে দারিদ্রের ছায়া।

* Dbq‡bi cwi‡ekMZ gj¨ t (Environmental Costs of Development) t-

উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন, বাঁধ নির্মান, রাস্তা তৈরি, জলাশয়, কলকারখানা ইত্যাদি তৈরি করার জন্য প্রচুর গাছপালা, বনজঙ্গল ধ্বংস করতে হয়ে। এর ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বন ধ্বংস হলে বন্যপ্রাণীদের যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি গরীব মানুষ, বিশেষ করে উপজাতি গোষ্ঠীর যারা বনকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জীবনে কষ্ট নেমে আসে। তাছাড়া গাছপালার অভাবে বৃষ্টিপাত কমে যায়, ভূ-গর্ভস্থ জল নিচে নেমে যায়, জ্বালানি কাঠের যোগান কমে যায়, ইত্যাদি জনজীবনে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে।

* Dbq‡bi gj¨vqb t (Assessing Development) t-

উন্নয়নের যেমন সামাজিক, পরিবেশগত মূল্য রয়েছে, তেমনি উন্নয়নের ইতিবাচক (Positive) দিকও রয়েছে । উন্নয়ন মূলক কাজকর্মের ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং দরিদ্রতা হ্রাস পায় । শিল্প-কলকারখানা স্থাপনের ফলে বেকার যুবক-যুবতীরা কাজের সন্ধান পায় এবং বেকারত্ব জীবন থেকে মুক্তি পায় । গ্রামের অদক্ষ শ্রমিকরাও বিভিন্ন কলকারখানায় অদক্ষমূলক কাজে নিয়োগ করা হয় । ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটে । উন্নয়নের ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মতো চাহিদাগুলো পূরণ হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটে।

* Dbq‡bi weKí aviণv t (Alternative Conceptions of Development) t-

উন্নয়নের সংকীর্ণ নীতি গ্রহণের ফলে প্রকল্পগুলো মানব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করেছে। তাছাড়া উন্নয়নের ফলে যে সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, -- সেগুলোর অসমবণ্টনের জন্য একটা শ্রেণি উপকৃত হয়েছে । বেশীর ভাগ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প ও পদ্ধতিগুলোর যাচাই এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল সিদ্ধান্তই উচ্চস্তরীয় রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা প্রণয়ণ করে থাকে। এই ধরণের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও কাজকর্মের পরিবর্তে বিকল্প পদ্ধতিতে উন্নয়নের লক্ষে পৌঁছানোকে উন্নয়নের বিকল্প ধারণা বলা হয়।

* MYZwšK AskMnণ (Democratic Participation) t-

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পদের জন্য বিবাদ অথবা উন্নত জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যে মত পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলো

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণকে গণতান্ত্রিক অংশ গ্রহণ বলা হয়। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকেই যদি সমষ্টিগত উন্নত জীবনের প্রত্যাশী হয়, তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সকল বাস্তবায়নের পন্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যুগে যে কোনো সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে একদল তাদের সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে। এই চাপিয়ে দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হবে সংঘাত। তাই বর্তমান দিনে যে কোনো উন্নয়ন মূলক কাজকর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে এলাকার বিরাট অংশের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তবেই উন্নয়ন সকলের মঙ্গল করবে।

* Dbqb I RxebhvÎv (Development and Life Style) t-

উন্নয়নের বিকল্প ধারা অতিমাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভরশীলতা, পরিবেশে বর্জ্য বৃদ্ধি, ব্যয়বহুল পরিকল্পনা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। দেশে ব্যবহারকারীর সংখ্যা, অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম কিংবা নিজস্ব গাড়ী ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে উন্নয়নকে পরিমাপ করা ঠিক নয়। তা করতে হবে, মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের সন্তুষ্টি এবং শান্তি ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাপনের ওপর উন্নয়নের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন করা হয়, তাকে বহতামান উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়নে নবীকরনযোগ্য সম্পদের প্রয়োগ বেশী পরিমাণে করতে হবে। তবেই মানুষের জীবন যাত্রার মানও উন্নত হবে। আর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটলেই প্রকৃত উন্নয়ন হয়েছে বলা যায়।

* cwi‡ekev` (Environmentalism) t-

পরিবেশের বিভিন্ন দূষণ সম্পর্কে যারা চিন্তা করে এবং কীভাবে পরিবেশকে নির্মল রাখা যাবে সে বিষয়ে সর্বদা ভাবতে থাকে, তাদের পরিবেশবাদী বলা হয় এবং তাদের চিন্তাধারাকে পরিবেশবাদ বলা হয় । পরিবেশবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মানব সমাজ এত বেশি পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং ধ্বংস করছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে দূষিত আবহাওয়া, বিষাক্ত নদী ও একটি অনুর্বর পৃথিবী । বর্তমানে পরিবেশ আন্দোলন একটি বিশ্বজনীন রূপ লাভ করেছে। এই আন্দোলনে সামিল হচ্ছে হাজার হাজার সংখ্যায় বেসরকারী সংগঠন ও সমাজসেবী । পরিবেশ আন্দোলন হিসাবে চিপকো আন্দোলনের কথা উল্লেখযোগ্য। ভারতের একটি সংগঠন হিমালয়ের বনাঞ্চল সংরক্ষণের কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে বিশ্ববিখ্যাত কিছু সংগঠন রয়েছে। যে গুলো পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। এইরকম দুটি সংগঠন হল --- গ্রিন পিস এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড (WWF) ।

* ‡Kb mv‡iv-DBqv-Gi Av‡›`vjb (Movement of Ken Saro-wiwa) t-

1950 খ্রিঃ নাইজেরিয়ার ওগোনি অঞ্চলে খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয় । সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন শুরু হয় । ফলে ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশ ও বৃহৎ বাণিজ্য ব্যবস্থার কারণে দুর্নীতি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয় । ফলে ঐ এলাকার উন্নয়ন বাধা পেল । ঐ ওগোনি অঞ্চলের অধিবাসী কেন সারো উইয়া (Ken Saro Wiwa) ছিলেন একজন সাংবাদিক, লেখক এবং টেলিভিশন প্রযোজক । তিনি দেখতে পান যে, ওই ওগোনি অঞ্চলে মানুষের উপর, কৃষকদের ওপর নির্যাতন চলছে । সেখানকার কৃষকরা জমি হারাচ্ছে এবং পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হচ্ছে । তাই তিনি নিম্নস্তরের সকল মানুষদের নিয়ে "মুভমেন্ট ফর দ্য সারভাইভাল অব দ্য ওগোনি পিপল" (MOSOP) নামে সবার জন্য উন্মুক্ত একটি রাজনৈতিক অহিংস আন্দোলন শুরু করেন । এই আন্দোলন এতটাই শক্তিশালী ছিল যে

1993 খ্রিঃ তেল কোম্পানীগুলো ওগোনি অঞ্চল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এই জন্য নাইজেরিয়ার সামরিক শাসকরা তাঁকে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সামরিক ট্রাইবুন্যালে বিচারের নামে প্রহসন করে 1995 খ্রিঃ মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের জন্য তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

* Òbg`v evPvl Av‡›`vjbÓ **(Narmada Bachao Movement) t-**

"নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন" ভারতের একটি সামাজিক আন্দোলন। নর্মদা নদীর ওপর যে বাঁধটি নির্মাণের কথা হয়, যা সর্দার সরোবর বাঁধ নামে পরিচিত। এই বাঁধটি গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র---এই তিনটি রাজ্যের উপর দিয়ে নির্মিত হতো। এর বিরোধীতা করে মানুষ অনশন, মিছিল ইত্যাদি সংঘটিত করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মেধা পাটেকর নামে এক সমাজকর্মী। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল নর্মদা নদীকে রক্ষা করে পরিবেশকে রক্ষা করা, অরণ্যের বিনাশ থেকে পরিবেশকে বাঁচানো। এই দিক দিয়ে আন্দোলনটি বৈধ ছিল।

mweav t-

(i) এই বাঁধটি নির্মান হলে 18.5 mm. হেক্টর জমির সেচের জল সরবরাহ করতে পারবে । এতে 3112টি গ্রাম এবং গুজরাটের 15টি জেলায় 73টি তালুক উপকৃত হবে ।

(ii) 173টি শহরে, 9490টি গ্রামে পানীয় জলের অভাব মিটবে ।

(iii) 1200 মেগাওয়াট ও 250 মেগাওয়াট দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠন করে বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাবার পরিকল্পনা নেয় ।

(iv) গুজরাটের পক্ষী সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলো উপকৃত হবে ।

Amweav t-

(i) 245টি গ্রামকে স্থানান্তর করতে হবে ।

(ii) অরণ্য সম্পদ ধ্বংস হবে ।

(iii) নদীর গর্ভে পলি জমে নদীখাত গভীরতা হারাবে ।

(iv) গ্রামের মানুষগুলো ভিটে ছাড়া হবে এবং তাদের পেশা হারাবে ।

ckgvb - 1

GKwU cYev‡K¨ DËi `vl t

1. "নর্মদা বাঁচাও" আন্দোলনের নেতা কে ?

   উত্তর ঃ মেধা পাটেকর।

2. "মুভমেন্ট ফর দ্য সারভাইভাল অব দ্য ওগোনি পিপল" আন্দোলনটি কে করেছিলেন ?

   উত্তর ঃ কেন সারো উইয়া

3. কেন্ সারো উইয়ার কে ছিলেন ?

4. কবে কেন্ সারো উইয়ারের মৃত্যু দন্ড দেওয়া হয় ?

5. কেন্ সারো উইয়া কোন্ দেশের নাগরিক ছিলেন ?

6. ভারত কবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ?
7. কোন্ সালে কেন সারো আন্দোলন শুরু হয় ?
8. চিপকো আন্দোলনের কাজের ক্ষেত্রটি কোথায় ছিল ?
9. উন্নয়ন কী ?
10. চিপকো আন্দোলন কী ?
11. UNDP-এর পুরো নাম কী ?
12. MOSOP-এর পুরো নাম কী ?
13. ভারতে দুটি পরিবেশ আন্দোলনের নাম লেখো।
14. পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত দুটি সংগঠনের নাম লেখো।
15. নর্মদা নদীর উপর যে বাঁধ নির্মাণের কথা বলা হয়, তার নাম কী ?

ckgvb - 2

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (৪০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

1. পরিবেশ বাদ কী ?
2. উন্নয়নের বিকল্প ধারণাটি কী ?
3. উন্নয়ন বলতে কী বোঝ ?
4. গণতান্ত্রিক অংশ গ্রহণ বলতে কী বোঝ?
5. সংশমিত বিকাশ (Sustainable Development) কী ?
6. উন্নয়নের ২টি বৈশিষ্ট্য লেখো।

ckgvb - 4

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (৮০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

1. উন্নয়নের পরিবেশগত মূল্যটি কী?
2. কেন্ সারো উইয়া এর আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করো।
3. উন্নয়ন মডেলের সমালোচনাগুলি কী?
4. উন্নয়ন মডেলের চারটি সমালোচনা লেখো।

ckgvb - 5/6

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

1. উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করো।
2. উন্নয়নের সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
3. উন্নয়নের বিকল্প ধারণার বিষয় হিসাবে অধিকারের দাবি ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

MODEL QUESTION
Political Science

Class- XI **Full Marks - 80**

wefvM- K

cwZwU c‡ki gvb - 1 **1x20=20**

(i) mwVK DËiwU evQvB করো ঃ **1x5=5**

১) ভারতীয় সংবিধান কত সালে কার্যকরী হয়-

ক) ২৬ শে নভেম্বর ১৯৪৯ খ) ৩ শে জানুয়ারী ১৯৫০ গ) ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৫০ ঘ) ৩০ শে নভেম্বর ১৯৪৯

২) শাসন বিভাগের প্রধান কে-

ক) প্রধানমন্ত্রী, খ) উপরাষ্ট্রপতি , গ) স্পীকার, ঘ) রাষ্ট্রপতি

৩) ভারতের প্রধান বিচারপতির অবসর গ্রহণের বয়স কত-

ক) ৬০ বছর , ঞ) ৬৫ বছর, গ) ৬২ বছর, ঘ) ৬৩ বছর

৪) "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়ে" - মন্তব্যটি কার -

ক) লাস্কি, খ) রুশো, গ) গার্নার, ঘ) জন লক

৫) থিয়োরি অফ জাস্টিস (Theory of Justice) - বইটির প্রবক্তা হলেন -

ক) জন রুলস্, খ) লক, গ) খবস্, ঘ) গার্ণার

(ii) GKwU cYv½ ev‡K¨ wb¤wjwLZ ck¸‡jvi DËi `vI : **1x15=15**

৬) ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা কে?

৭) কোন্ স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি সংগঠিত হয়?

৮) সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট (Social Contract) বইটির রচয়িতা কে?

৯) সাম্য স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচতে পারে না- উক্তিটি কার?

১০) ভারতের নির্বাচন কমিশনানরকে কে নিয়োগ করেন?

১১) ভারতীয় সংবিধানের কতগুলো অনুচ্ছেদ এবং তফশিল রয়েছে?

১২) কখন ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনটি ভারতের সংসদ কর্তৃক পাশ হয়েছিল?

১৩) এমন একজন চিন্তাবিদের নাম করো যিনি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার পক্ষে ছিলেন?

১৪) নাগরিকদের যে কোনো একটি পৌর অধিকারের নাম লেখো ?

১৫) 'স্বাধীনতা ' শব্দটি কেনান্ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

১৬) এমন একটি দেশের নাম লেখো, যেখানে দ্বিনাগরিকতা স্বীকৃত রয়েছে?

১৭) ভারতের এমন একটি রাজ্যের নাম করো যেখানে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে?

১৮) গণপরিষদের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

১৯) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে পদচ্যুতি করতে পারেন?

২০) কোন্ সংশোধনী আইনের দ্বারা ভারতে সংবিধানের প্রস্তাবনা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যুক্ত হয়েছে?

wefvM- L

cwZwU c‡ki gvb - 2 **2x3=6**

bx‡Pi cwZwU c‡ki DËi 40 wU k‡ãi g‡a¨ †j‡Lv :-

২১) 'অর্থবিল' কী?

২২) একজন সুনাগরিকের যেকোন দুটো গুণের উল্লেখ করো।

২৩) উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাগুলো লেখো।

wefvM- M

cwZwU c‡ki gvb -4 **4x4=16**

নীচের cwZwU c‡ki DËi 60 wU k‡ãi g‡a¨ `vI|

২৪) ভারতীয় নাগরিকদের যে কোনো চারটি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করো।

২৫) মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝ?

২৬) মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস আলোচনা করো।

২৭) "সাম্য এবং স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক" ব্যাখা করো।

wefvM- N

cwZwU c‡ki gvb - 5 **5x4=20**

নীচের cwZwU c‡ki DËi 150 wU k‡ãi g‡a¨ `vI|

২৮) জন রুলসের ন্যায় তত্ত্বের ধারণাটি উল্লেখ করো।

২৯) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। প্রত্যেক ধরণের অধিকারের উদাহরণ দাও।

৩০) রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিধি বিশ্লেষণ করো।

*অথবা

রাজনৈতিক তত্ত্বের অধ্যয়ন আমাদের জন্য কেন প্রয়োজনীয় ?

৩১) প্রদত্ত ভারতের রাজনৈ তিক মানচিত্রের 1 ,2, 3, 4, 5 চিহ্নিত স্থানগুলোকে নির্দেশ অনুসারে সনাক্ত কর ও নাম লেখো ঃ-

(1) লাদাকের রাজধানী (2) পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী (3) দালাই লামার বাসস্থান (4) দক্ষিণ ভারতের নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য (5) ভারতের প্রথম তৈল ক্ষেত্র

wefvM- O

cwZwU c‡ki gvb - 6 **6x3=18**

নীচের cwZwU c‡ki DËi 150 wU k‡ãi g‡a¨ `vI|

৩২) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো।

৩৩) ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলো কী কী ?

৩৪) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

অথবা

'ভারতীয় সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল- ব্যাখা করো।